রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জনগণের কর্তব্য

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জনগণের কর্তব্য — প্রভাস ঘোষ
(৫ আগস্ট, ২০১৯-এর ভাষণ)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১ অক্টোবর, ২০১৯

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ দশ টাকা

প্রকাশকের কথা

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ-এর স্মরণদিবস উপলক্ষে এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর সময়োপযোগী মূল্যবান বক্তব্য ইতিমধ্যে পার্টির বাংলা মুখপত্র গণদাবী-র ৭২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় এবং ইংরেজি অনুবাদ প্রোলেটারিয়ান এরা-র ৫৩ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচনাটির গুরুত্ব অনুভব করে বর্তমানে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হল। প্রকাশের সময় কমরেড প্রভাস ঘোষ সামান্য সংযোজন করেছেন।

১ অক্টোবর, ২০১৯ — অমিতাভ চ্যাটার্জী

কলকাতা — সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি

৫ আগস্টের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এ কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন রাখে না যে, আজকের এই দিনটি আমাদের সকলের জীবনে গভীর ব্যথা-বেদনা, আবেগ ও স্মৃতির সাথে জড়িত। আপনারা জানেন, আমাদের কোনও অনুষ্ঠানই নিছক আনুষ্ঠানিক নয়। আজকের এই অনুষ্ঠান তো নয়ই। কোনও কোনও শোক থাকে যা সময়ের গতিপথে থিতিয়ে যায়, মিলিয়ে যায়। আবার একেকটি শোক থাকে যা, যত দিন যায়, মাস যায়, বছর অতিক্রান্ত হয় ততই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, চেতনার গভীরে ও উপলব্ধিতে এমন আবেদন সৃষ্টি করে যে তা বারবার বিবেককে, কর্তব্যবোধকে নাড়া দেয়, জাগিয়ে রাখে।

আজ দল অনেক বড় হয়েছে। এই স্মরণসভা ভারতবর্ষের ২৩টি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দলে এখন অনেক মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক ঘরের যুবক-যুবতী, ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছেন। তারা অনেকেই ভালভাবে জানেন না, কী কঠিন ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুংয়ের সুযোগ্য উত্তরসাধক কমরেড শিবদাস ঘোষ মাত্র ছয় জনকে নিয়ে এই দলটি গড়ে তুলেছিলেন। এ বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করব।

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বেদ-বেদান্ত-কোরান-বাইবেল থেকে আসেনি

আজকের এই সভায় সর্বপ্রথমে আমি সদ্য অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচন ও তার ফলাফল সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে দলের বিশ্লেষণ আপনাদের কাছে রাখব। প্রথমেই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি ইতিহাসে চিরদিন ছিল না, বেদ-বেদান্ত, কোরান, বাইবেলের বাণী থেকে তা আসেনি। পার্লামেন্ট, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির প্রতিবাদ ও আন্দোলন করার অধিকার, সেকুলার হিউম্যানিজম বা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদ, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজ, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী ইত্যাদি ঘোষণা নিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ইউরোপে এসেছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পটভূমিতে। বণিকি পুঁজির গর্ভজাত শিল্পপুঁজি সেদিন ছিল ক্ষুদ্র শিল্পের স্তরে। এই সদ্যোজাত শিল্পপুঁজির বিকাশের স্বার্থে, ব্যাপক শিল্পায়নের স্বার্থে সেদিন পুঁজিবাদের কৈশোর-যৌবনের স্তরে তার সাথে ধর্মভিত্তিক রাজতন্ত্রের যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে প্রগতিশীল

বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে গ্রামীণ ভূমিদাসদের সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে রাজতান্ত্রিক ধর্মীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বাইবেল সহ কোনও ধর্মীয় অনুশাসনে নয়, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত সংবিধান দ্বারাই শাসন পরিচালিত হবে, এটা নির্ধারিত হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে ছিল অবাধ ও স্বাধীন প্রতিযোগিতা, তাকে ভিত্তি করে মাল্টি ইন্ডাস্ট্রি, আবার তাকে ভিত্তি করে মাল্টি পার্টি বা বহুদলীয় গণতন্ত্র এসেছিল। তার ঘোষণা ছিল বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। প্রথম যুগে এই ঘোষণা খানিকটা রক্ষা করতে পারলেও পুঁজিবাদের বিকাশের পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ যখন ক্ষুদ্র পুঁজি বৃহৎ পুঁজিতে পরিণত হল, বৃহৎ পুঁজি একচেটিয়া ও লগ্নি পুঁজিতে পরিণত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হল, তখন থেকেই প্রগতির ঝাণ্ডা ফেলে প্রতিক্রিয়াশীল হল, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী পদদলিত হতে শুরু করল। গণতন্ত্র ধূলায় লুণ্ঠিত হতে শুরু করল। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির বুলি আউড়েই একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উন্নীত পুঁজিবাদী দেশগুলি শুধু নিজ দেশের শ্রমিকদের শোষণই নয়, অনুন্নত দেশগুলিকেও পদানত করে ঔপনিবেশিক-আধা ঔপনিবেশিক শোষণ-লুণ্ঠন চালাল, স্বাধীনতা আন্দোলনগুলি দমন করার জন্য নৃশংস অত্যাচার করল, দুই দুই বার বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বালাল। ১৯১৭ সালে এই একচেটিয়া পুঁজির স্তরে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্তরে নির্বাচন সম্পর্কে মহান লেনিন বলেছেন, "বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার প্রকৃত চরিত্র হচ্ছে পার্লামেন্টের মাধ্যমে শাসক শ্রেণির হয়ে কোন সদস্যরা জনগণের উপর শোষণ-অত্যাচার চালাবে, এটা ঠিক করা"[১]। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬৯ সালে বলেছেন, "ইলেকশন হচ্ছে একটা বুর্জোয়া পলিটিক্স। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম এবং শ্রেণিসংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে শিল্পপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে যে হাওয়া তোলে, যে আবহাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মতো সেই দিকে ভেসে যায়"[২]। বাস্তবে আমাদের দেশের ইলেকশনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই ইলেকশনে কে জিতবে, বাস্তবে তা কে ডিসাইড করে? জনগণ করে? ফলে বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল বলে এখন আর কিছু নেই। এখন হচ্ছে বাই দ্য বুর্জোয়াজি, অফ দ্য বুর্জোয়াজি, ফর দ্য বুর্জোয়াজি। বুর্জোয়ারাই ঠিক করছে কে জিতবে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল এখন জনমতের রায় নয়, শোষক বুর্জোয়া শ্রেণির রায়। অন্য সব প্রশ্ন যদি বাদও দিই, একটা বিষয় তো ভাবতে হবে, পার্লামেন্টে দাঁড়াতে হলে ২৫ হাজার টাকা জমা দিতে হয়। বিধানসভায় দাঁড়াতে হলে ১০ হাজার টাকা জমা দিতে হয়। এদেশের কোনও

১। রাষ্ট্র ও বিপ্লব— লেনিন

২। অপ্রকাশিত ভাষণ— শিবদাস ঘোষ

শ্রমিক-কৃষক-দরিদ্র মানুষ ভাবতে পারে ইলেকশনে দাঁড়ানোর কথা? তারাই তো অধিকাংশ ভোটার। তাছাড়া কোটি কোটি গরিব মানুষ যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য, কাজের জন্য এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, যাদের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ নেই, তাদের কাছে রাজনীতি চর্চার সুযোগ কোথায়, যদি সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংঘবদ্ধ না করায়, নৈতিক বলে বলীয়ান না করায়। ফলে তারা ধরেই নেয় পলিটিক্স চর্চা বড়লোকদের জন্য, গরিবদের জন্য নয়। ফলে তাদের ভোটে দাঁড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি রাজনীতি বুঝে ভোট দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে না। তাই তারা বড় বড় পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের দেওয়া টাকায় নিজেদের বিবেক বিক্রি করে, সংবাদমাধ্যমের হাওয়ায় উলুখাগড়ার মতো ভেসে যায়।

নির্বাচন মানে টাকার খেলা

দেশে কোটি কোটি বেকার। আর এই বেকারবাহিনী অপেক্ষায় থাকে কবে ভোট আসবে। কোন দল কত বেশি টাকা দেবে, তার হয়ে নামবে। রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের সময় বিপুল টাকা দিয়ে, মদ-মাংস খাইয়ে এদের দিয়ে যেকোনও হীন কাজ করিয়ে নেয়। আরেকটা জিনিসও খুব দুঃখজনক। গরিব মানুষের মধ্যে একটা চিন্তা এসে গিয়েছে— ভোটের পরে তো কিছু পাব না, তবু ভোটের সময় কিছু টাকা তো নিই। এই ভাবে মানুষ তার ভোট বিক্রি করে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে বুর্জোয়া দলগুলি ভোট কেনে।

এবারের ভোটে কী হয়েছে? গত ভোটের আগে বিজেপি কথা দিয়েছিল জনগণের জন্য 'আচ্ছে দিন' আনবে, কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা পাঠাবে, বছরে ২ কোটি চাকরি দেবে, কৃষকদের ঋণ মকুব করবে, জিনিসপত্রের দাম কমাবে, দুর্নীতি দমন করবে। বলেছিল— 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'। কংগ্রেসের দুঃশাসনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ভাবল হয়তো বা এরা কিছু করবে। কিন্তু এ হল সবই ভোজবাজি, ভাঁওতা। বিজেপি প্রেসিডেন্ট তো খোলাখুলি বলেই বসলেন 'এসব প্রতিশ্রুতি হচ্ছে জুমলা'। জনগণের সঙ্কট ও বিক্ষোভ চরমে উঠল। তার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস গুজরাট নির্বাচনে প্রায় জিতে যাচ্ছিল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়— যেগুলি দীর্ঘদিন বিজেপি'র ঘাঁটি বলে পরিচিত, সেখানে কংগ্রেস জিতে গেল। গোরখপুরে পার্লামেন্ট উপনির্বাচনে বিজেপি হারল, এসব দেখে বিরোধী শিবির ধরেই নিয়েছিল যে এবার তারাই জিতবে। কে ক'টা সিট দখল করবে, কোন সিট নিজেদের হাতে রাখবে— এসব দর কষাকষি শেষপর্যন্ত চালাতে লাগল, অনেকটা কালনেমির লঙ্কাভাগের মতো। কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও ছাড়বে না। বারবার মিটিং করেও জাতীয় বুর্জোয়া কংগ্রেস দল ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি পূর্ণাঙ্গ ঐক্য করতে পারল না, তা ভেস্তে গেল।

বিরোধীদের মধ্যে কে প্রধানমন্ত্রী হবে এ নিয়ে ৫/৬ জন দাবিদার এসে গেল। এদিকে ভোটের আসল নিয়ন্তা বৃহৎ পুঁজিপতি-মাল্টিন্যাশনালরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা দেখল, এই পাঁচ বছরে বিজেপি যা সার্ভিস দিয়েছে তা কংগ্রেসের গত রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এখনই সিট নিয়ে, প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে এদের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব, অনৈক্য, তারপর কোয়ালিশন সরকার হলে স্থায়ী সরকার হবে না, কোন্দল আরও বাড়বে। ফলে তারা ঠিক করল, বিজেপিকেই জেতাতে হবে। বিজেপিকে জেতানোর জন্য কর্পোরেট সেক্টরের ইলেকশন বন্ডের ৯৫ শতাংশ বা ২১০ কোটি টাকা দেওয়া হল তাদের। কংগ্রেস পেয়েছে ৫ কোটি এবং সিপিএম পেয়েছে ২ কোটি টাকা। ২৭ হাজার কোটি টাকা বিজেপি ইলেকশনে খরচ করেছে। এ তো প্রকাশ্য হিসাব, এর বাইরে আরও কত হাজার কোটি টাকা তারা ব্যয় করেছে। কারা এই টাকা দিল? এই সমস্ত টাকা তারাই দিল যাদের জন্য বিজেপি 'আচ্ছে দিন' এনেছে।

এই বিজেপির রাজত্বের এক চিত্র আপনারা দেখুন। ভারতবর্ষে এক শতাংশ ধনী দেশের সম্পদের ৭৩ শতাংশের মালিক। গত ২০১৭-'১৮ সালে এই এক শতাংশ ধনীর সম্পদ বেড়েছে ২০ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা। ফলে বিজেপিকে ওরা আশীর্বাদ তো করবেই! শুধু মুকেশ আম্বানির দৈনিক আয় গড়ে ৩০০ কোটি টাকা[৩]। গত তিন বছরে তার সম্পদ বেড়েছে ৬৬ শতাংশ, গৌতম আদানির সম্পদ বেড়েছে ৬৬ শতাংশ, গৈরিক বসনধারী রামদেবের আয় বেড়েছে ১৭৩ শতাংশ। এখন তো সবকিছুরই ব্যবসা করে এই রামদেব। এই সময়ে বিজেপি সভাপতির নিজের ব্যবসার আয় বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। তাঁর ছেলের আয় বেড়েছে ১৬০০ শতাংশ। ব্যাঙ্ক থেকে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭০২ কোটি টাকা এরা ঋণ নিয়েছে, বিজেপি সরকার সেই ঋণ মকুব করে দিয়েছে। ব্যাঙ্কের টাকা মানে পাবলিকের টাকা। ট্যাক্স ছাড় বাবদ বৃহৎ শিল্পপতিদের ১৩ লক্ষ কোটি টাকা উপরি দিয়েছে। তারা অবাধে দুর্নীতি চালিয়েছে। দেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা সঞ্চয় করেছে। কালো টাকা কারা সঞ্চয় করে? ছোট দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, না এই বড় বড় ব্যবসায়ীরা? ফলে বিজেপি সরকার একটা কালো টাকাও খুঁজে পায়নি। কালো টাকার ব্যবসায়ীদেরও খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও। কী করে খুঁজে পাবে? তারা তো দোস্ত, নেতা-মন্ত্রীদের আশেপাশেই ঘুরছে। তারাই তো ফান্ড জোগাচ্ছে, যেমন একসময় কংগ্রেসকেও দিয়েছে।

বালাকোটকে ব্যবহার করে হাওয়া তোলা হয়েছে

এবারের ইলেকশনে তো আপনারা দেখেছেন, একে অপরের বিরুদ্ধে কী কাদা ছোড়াছুড়ি করেছে, কী কুৎসিত ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে কদর্য আক্রমণ করেছে, বাবা-মা তুলে পর্যন্ত গালিগালাজ করেছে। বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা নোংরামি, শালীনতার শেষ সীমা অতিক্রম করেছে। মন্ত্রীত্বের উদগ্র লালসায় ওরা সব কিছুই

৩। ইকনমিক টাইমস, ২৫ সেপ্টেম্বর '১৮

করতে পারে। এ অবস্থায় কংগ্রেস তুলল বিজেপি সরকারের রাফালে যুদ্ধ বিমানের দুর্নীতির প্রসঙ্গ। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্টের নিজের স্বীকৃতি— ভারতের বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে অনিল আম্বানিকে এই যুদ্ধ বিমানের বরাত পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, যার নিজস্ব কোনও বিমান তৈরির কারখানাও ছিল না। সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে গেল, প্রতিরক্ষা দপ্তরের আমলাদের লিখিত অভিযোগ যে, এই চুক্তি আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আমলারা নিয়ম বহির্ভূতভাবে নাক গলিয়েছে। এসবের সদুত্তর দিতে না পেরে বিজেপি পাল্টা কংগ্রেসের বোফর্স কেলেঙ্কারির প্রশ্ন তুলল, যে কেলেঙ্কারি আজও ধামাচাপা পড়ে আছে। যেমন এখন ইলেকশন শেষ হয়ে গেছে, কংগ্রেস আর রাফালে তদন্ত নিয়ে উচ্চবাচ্য করছে না। আবার ইলেকশন এলে হয়তো তুলবে। দুই দলই দুই দলের কেলেঙ্কারি জানে, প্রয়োজনে তোলে, আবার ধামাচাপা দেয়। কখনও শুনেছেন, দুর্নীতির জন্য বড় বড় শিল্পপতি, মন্ত্রী, আমলাদের সাজা হয়েছে? সাজা হয় ছিঁচকে চোরদের। এটাই হচ্ছে মোদিজির 'না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা'। নীরব মোদি, মেহুল চোক্সি, বিজয় মালিয়াদের বিদেশে যেতে কে সাহায্য করেছে— এই প্রশ্নের আজও কোনও সদুত্তর নেই। এই অবস্থায় ভোটযুদ্ধের উত্তাপ যখন বাড়ছে, 'কী হয় কী হয়' মানুষ ভাবছে, তখন হঠাৎ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলা হল, বেশ কয়েকজন জওয়ান মারা গেল। যদিও এর আগে কাশ্মীরে বহু জঙ্গি হামলা হয়েছে। সরকারই বলেছে ২ জন জঙ্গি মারতে ১ জন জওয়ান —এই হারে মারা গেছে। পুলওয়ামায় এই দুঃখজনক ঘটনাকে বিজেপি ইলেকশন ইস্যু করে ফেলল। পাল্টা পাকিস্তানের বালাকোটে বিমান হানা চালাল। দেশব্যাপী প্রচারের ঝড় তুলল— প্রধানমন্ত্রী কত বড় বীর, তিনি কী মহান দেশরক্ষক, পাকিস্তানকে কেমন জব্দ করলেন! এর আগে কংগ্রেসও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে এবং অন্য ভারত-পাক যুদ্ধকে ইলেকশনে একইভাবে কাজে লাগিয়েছে। ফলে বিজেপি এবার বালাকোটকে ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক হাওয়া তুলল।

কংগ্রেসের রাজনীতি আলাদা কিছু নয়

এছাড়া ইলেকশন কমিশন তো নগ্নভাবে বিজেপির হয়ে কাজ করেছে। এখন ভোটেও সবরকম জালিয়াতি হয়। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে জালিয়াতির তদন্ত চলছে। ভোটের শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী একেবারে গৈরিক বসন পরে কেদারনাথে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন! ইতিপূর্বে হিন্দু ভোট টানার জন্য তারা যা করার সব কিছু করেছে। যদিও সিপিএম-এর 'সেকুলার বন্ধু' কংগ্রেসও কম করেনি, বিজেপির সাথে পাল্লা দিয়ে কে আগে কোন মন্দিরে পুজো দেবে, কোথায় কোন দেবতার আশীর্বাদ চাইবে— এ সবই করেছে। কিন্তু কেদারনাথ যাওয়া তাদের মাথায় আসেনি। সে যাই হোক, প্রকৃত কেদারনাথ অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণিই ঠিক করেছিল এবারও বিজেপিকেই গদিতে বসাবে এবং বসিয়েছেও। তাই দেখুন, নরেন্দ্র মোদির শপথ

অনুষ্ঠানে কারা হাজির ছিল? এইসব বৃহৎ পুঁজিপতিরাই। এটা তো তাদেরই বিজয় অনুষ্ঠান! মনে রাখবেন, এখন রাজতন্ত্র নেই, কিন্তু রাজা আছে, গণতন্ত্রের মোড়কে বুর্জোয়ারাই রাজত্ব চালায়। আর মন্ত্রীসভা হচ্ছে ওদের হুকুমে চলা পলিটিক্যাল ম্যানেজার।

এদিকে ইলেকশনে ভরাডুবি হয়ে বিরোধী জাতীয় বুর্জোয়া দল কংগ্রেস ও অন্যান্য আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, চরম হতাশায় ভুগছে। যদিও বুর্জোয়া শ্রেণি ভবিষ্যতের স্বার্থে এই দলগুলিকে আবার খাড়া করবে। যখন বিজেপি অতীতের কংগ্রেসের মতো খুবই আনপপুলার হবে, তখন কংগ্রেসকে 'ত্রাতা' হিসাবে জনগণের সামনে এনে হাজির করবে। বুর্জোয়া দ্বিদলীয় গণতন্ত্রে এরকম পাল্টাপাল্টি ইউরোপে, মার্কিন দেশে হচ্ছে, এদেশেও হচ্ছে।

সিপিএম, সিপিআই-এর অবস্থাও চরম সঙ্কটজনক। যে অবিভক্ত সিপিআই (যার মধ্যে সিপিএম, সিপিআই, নকশালপন্থীরা ছিল) ১৯৫২ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরে সর্বাধিক সিট পেয়ে প্রধান বিরোধী দল হয়েছিল, তারা দীর্ঘদিন এমন 'বামপন্থা' চর্চা করেছে যে এবার নির্বাচনে সিপিএম নিজস্ব শক্তিতে ১টি ও ডিএমকের কাঁধে ভর করে আরও ২টি সিট এবং সিপিআই একইভাবে ২টি সিট পেয়েছে। এমনই দুরবস্থা ওদের! এই দু'টি দলের নেতৃত্ব ভোটে ফায়দা তুলতে কংগ্রেস ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলিকে 'সেকুলার' ও 'গণতান্ত্রিক' তকমা লাগিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিছু সিট পাওয়ার জন্য। অথচ এই কংগ্রেস ধর্মের সাথে আপস করে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেছে, ক্ষমতায় এসে ধর্মান্ধতাকে কাজে লাগিয়েছে, আরএসএস-বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিহারের ভাগলপুরে, ওড়িশার রাউরকেল্লায়, আসামের নেলীতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এবং দিল্লিতে শিখদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা। এগুলি কি সেকুলারিজমের লক্ষণ? যথার্থ সেকুলারিজম মানে ধর্মের সাথে রাজনীতি, শিক্ষা, সস্কৃতির সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম ব্যক্তির বিশ্বাসের বিষয় হবে। এই ধারণাই ইউরোপে নবজাগরণ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব এনেছিল। এদেশে নেতাজি সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচন্দ, সুব্রমন্য ভারতী, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালারা সেকুলারিজমের এই ধারণা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভয়ে ভীত ভারতীয় বুর্জোয়ারা এবং তাদের প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব যেমন রাজনৈতিকভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল, তেমনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মনন যাতে দেশে গড়ে না ওঠে তার জন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিন্তার সাথে আপস করেছিল। যার ফলে সংখ্যালঘু জনগণ ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের অধিকাংশ মানুষ জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু নেতৃত্ব গণ্য করে স্বাধীনতা আন্দোলনের বাইরে ছিল। এর সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ, আরএসএস-এর সম্মতিক্রমে দেশভাগ করাল।

স্বাধীন ভারতে ক্ষমতায় থাকাকালীন কংগ্রেস শুধু জরুরি অবস্থা জারিই নয়, টাডা, মিসা, আফস্পা, ইউএপিএ ইত্যাদি কালাকানুন চালু করেছে। গণআন্দোলন দমনে কত শত শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবককে হত্যা করেছে। সেই কংগ্রেসকে সিপিএম, সিপিআই 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দিচ্ছে। আর আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি তো নানা প্রাদেশিকতাবাদ ও জাতপাতের রাজনীতি করছে। এরা সকলেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির চর্চা করছে। ক্ষমতায় থাকাকালীন এরাও কংগ্রেস-বিজেপির মতো গণআন্দোলনে দমন-পীড়ন চালিয়েছে। এদেরকেও সিপিএম, সিপিআই, 'সেকুলার' ও 'গণতান্ত্রিক' লেবেল লাগিয়ে ঐক্যের চেষ্টা করেছে সিটের লোভে। কংগ্রেস সহ এই দলগুলির দরজায় দরজায় গেছে সিপিএম ও সিপিআই নেতারা, একমাত্র ডিএমকে ছাড়া কেউ সাড়া দেয়নি।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও বলতে চাই, বিগত বিজেপি শাসনের বিরুদ্ধে যখন রাজ্যে রাজ্যে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুবক বিক্ষোভ লড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়েছিল, আমরা চেয়েছিলাম বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব দিক। তাহলে দেশে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন জোরদার হবে, শক্তিশালী বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠবে। কিন্তু তারা সাড়া না দিয়ে কংগ্রেসের সাথে বোঝাপড়ায় মগ্ন রইলেন। নেতৃত্বহীন অবস্থায় আন্দোলনগুলি থিতিয়ে গেল। অতীতেও সিপিএম-সিপিআই ইন্দিরা কংগ্রেসকে 'সেকুলার', 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে সমর্থন করেছে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে কংগ্রেসের সাথে বোঝাপড়া করেছে। একই ভাবে ১৯৭৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা দেশব্যাপী গণআন্দোলনে তারা যোগ দেয়নি, যার সুযোগ নিয়ে এই আন্দোলনে ঢুকে ফয়দা তুলে আরএসএস-জনসংঘ শক্তি বাড়াল। আবার ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসী 'স্বৈরাচার'-এর বিরুদ্ধে জনতা পার্টির (যার মধ্যে আরএসএস-জনসংঘ ছিল) সাথে সিপিএম হাত মেলাল। একই যুক্তিতে ১৯৮৯ সালে ভি পি সিং সরকারকে সিপিএম-বিজেপি যুক্তভাবে সমর্থন জানাল। কলকাতা ময়দানে জ্যোতি বসু-বাজপেয়ী একত্রে মিটিং করেছিলেন। বিজেপি-র সমর্থনে কলকাতা কর্পোরেশন চালিয়েছিল সিপিএম। ভোটের স্বার্থে এই ধরনের নিকৃষ্ট সুবিধাবাদের চর্চা তারা বার বার করেছে।

এস ইউ সি আই (সি) সর্বদা বিপ্লবী লাইনের ভিত্তিতেই নির্বাচনে লড়াই করে

আপনারা জানেন, এই পরিস্থিতিতে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্ধারিত গাইড লাইনের ভিত্তিতে বহু রাজ্যেই নির্বাচনে লড়েছে এ কথা জেনেই যে, আমরা কোনও সিট পাব না। টাকার খেলায় ও পোলারাইজেশনের হাওয়ায় ভোটও বিশেষ পাব না। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, 'যতদিন না বিপ্লব হয়,

জনতা ইলেকশন চাক বা না চাক, পছন্দ করুক, নাই করুক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, জনতাকে টেনে আনা হয়। জনতা এসে যায়। বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে ইলেকশনের প্রয়োজনীয়তা নেই। যখন সকলে এই চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সংগঠিতভাবে ইলেকশন বর্জন করছে। নেগেটিভলি বর্জন করছে না, পজিটিভলি তারা আপরাইজিং বা গণঅভ্যুত্থানের জায়গায় চলে গেছে। যখন সে বলে— না, ইলেকশন নয়, ক্ষমতা দখল। তখনই একমাত্র ইলেকশন অকার্যকরী হতে পারে। না হলে ইলেকশনে জনতা বারবার ফেঁসে যায়। আর জনতার সঙ্গে থাকার জন্য বিপ্লবীকেও ইলেকশনে যেতে হয়। আর বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার লক্ষ্য থেকে প্রলেটারিয়েট যখন অনন্যোপায় হয়ে জনতার সঙ্গে থাকার জন্য নির্বাচনী লড়াইতে যায়, তখন সে জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যায়। সিট জেতবার জন্য সেও চেষ্টা করে সাধ্য মতো। কিন্তু তার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুটা কখনওই যেভাবেই হোক সর্বাধিক আসন দখল করা হয় না। তার মেইন ফোকাল পয়েন্টটা হয়, জনতাকে একটা মাস রেভলিউশনারি লাইনের ভিত্তিতে ইলেকশনে লড়াই করতে শেখানো এবং সেটা করতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম সিট পাই পাব, যদি না পাই, একটাও না পাই, না পাব। ... কিন্তু তার সেন্ট্রাল ফোকাল পয়েন্ট কখনও হবে না ... যেন তেন প্রকারেণ যে কোনও উপায়ে কতকগুলি সিট গ্র্যাব করা। ... শত্রুকে হারাবার জন্য যা দরকার, তাই কর— এসব যুক্তি যদি তোলো, বিপ্লবী তকমা এঁটে তোলো, তাহলে কিন্তু বুর্জোয়ারা যেভাবে ইলেকশন ফাইট করে, তুমিও আসলে সেই কৌশলটি, সেই কায়দাটি বিপ্লবের নামে চালু করার চেষ্টা করবে। এতে কি বিপ্লবী হওয়া যায়? এর দ্বারা কি বিপ্লবের কাজ এগোয়? না, এতে বিপ্লবী হওয়া যায় না এবং এর দ্বারা বিপ্লবী কাজও এগোয় না" (শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে ঃ শিবদাস ঘোষ)। এই শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আমাদের দলের কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক নির্বাচনে কাজ করেছে, সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আমাদের দলের বৈপ্লবিক বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছে। আমরা জিতব না ভেবে অনেকেই ভোট দেয়নি, এ কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের নৈতিক সমর্থন দিয়েছে, নমিনেশন ফাইলের টাকা থেকে শুরু করে নির্বাচনের যাবতীয় খরচ সাধারণ মানুষই দিয়েছে। ঘরে ঘরে রাস্তায় রাস্তায় আমাদের কর্মীরা চাঁদা তুলেছে, জনগণ সাগ্রহে দিয়েছে গরিবের দল গণ্য করে।

এ কথা সবাই জানে, কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে শিক্ষিত আমাদের দল কোনও দিন শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে নিজেদের বিক্রি করেনি, টাকার জন্য হাত পাতেনি। পার্টির দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাবার জন্য, আন্দোলন চালাবার জন্য, কোনও প্রোগ্রাম করার জন্য আমরা সাধারণ মানুষের কাছেই হাত পাতি এবং তারাও ভালবেসে মুক্তহস্তে সাহায্য করেন। বরং বহু লোক স্নেহচ্ছলে ঠাট্টা করে বলে, আপনারা পাগল, এজন্যই ভোটে জিতছেন না। অন্য দল টাকা দেয়, সুযোগ

সুবিধা দেয়, ভোট চায়। কাগজে টিভিতে ওদের কত প্রচার! আর আপনাদের সংবাদমাধ্যমে নামগন্ধ নেই, আপনারা চাঁদা চান, আবার ভোটও চান। আজকের দিনে এইরকম নীতি-আদর্শ নিয়ে জেতা যায়? আমাদের কর্মীরা তাদের কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, ভোট পাই না পাই, আপনাদের ভালবাসা, সমর্থনই আমাদের সম্বল। ভোটের উদ্দেশ্যে সংবাদমাধ্যমে প্রচারের জন্য ছুটব না। টাকার জন্য টাটা, আম্বানি, আদানি, জিন্দাল, মিত্তালদের কাছে নিজেদের বিক্রি করব না। এভাবেই বিপ্লবী দল হিসাবে আমরা এগোচ্ছি এবং এগোব। এবার নির্বাচনে আমরা কোনও সিট না পেলেও বহু নতুন কর্মী-সমর্থক পেয়েছি, বহু সৎ বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন মানুষকে পেয়েছি। এদের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক-যুবক-মহিলা-ছাত্র, সর্বস্তরের মানুষ আছেন। নতুন জায়গায় যোগাযোগ পেয়েছি, আর পেয়েছি অজস্র মানুষের ভালবাসা। তারা বারবার বলেছেন, আর সবাই পচে গেছে, আপনারাই একমাত্র ভরসা। আপনারা আরও দ্রুত বড় হোন। নির্বাচনী লড়াইয়ে এই সাফল্য পেয়ে আমাদের দলের কর্মীরা উদ্দীপিত, অনুপ্রাণিত, তাদের মধ্যে হতাশার লেশমাত্র নেই। কারণ তারা মহান লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে জানে রাশিয়া, চিন, ভিয়েতনামে কোথাও ভোটের মাধ্যমে, সিটের জোরে বিপ্লব হয়নি, বিপ্লব হয়েছে বিপ্লবী আদর্শে শিক্ষিত, সুসংগঠিত, উন্নত নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান বিপ্লবী জনগণের শক্তিতে। এই বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসাবে চাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির ব্যাপক সংগ্রাম ও গণআন্দোলন।

বিজেপি-র শক্তিবৃদ্ধির কারণ

বিশ্বের সর্বত্র পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্লামেন্টারি ফ্যাসিস্ট অটোক্রেসি। যদিও পার্লামেন্টের ঠাট-বাট সবই আছে। ১৯৪৮ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানি-ইটালি পরাস্ত হলেও বিশ্বের উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই নানা রূপে ফ্যাসিবাদ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলেছিলেন, ফ্যাসিবাদ যথার্থ মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। অন্ধতা, গোঁড়ামি, যুক্তিহীনতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ঐতিহ্যবাদ এগুলিকে গড়ে তুলছে ফ্যাসিবাদ। কংগ্রেসই এ দেশে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। আজ বিজেপি ক্ষমতাসীন হয়ে ফ্যাসিবাদকে আরও শক্তিশালী করছে। আপনাদের বুঝতে হবে বিজেপি এভাবে শক্তি বাড়াতে পারল কী করে? পুঁজিপতি শ্রেণির সর্বাত্মক মদত তো আছেই, যেমন আগে কংগ্রেসও পেয়েছে। একটা কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। সেটা হচ্ছে ১৯৭৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে প্রবল শক্তিশালী সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে সিপিএম-সিপিআই দল না থাকায় আরএসএস-জনসংঘ একতরফা সুযোগ পেয়েছিল এ থেকে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির ফায়দা তুলতে। এছাড়াও প্রধানত আরও তিনটি কারণ কাজ করেছে বিজেপির এই

শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে। প্রথমত, বিপ্লবভীত জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ গ্রহণ না করে ধর্মীয় চিন্তা, ঐতিহ্যবাদ, বর্ণভেদ, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদির সাথে আপস করেছিল। যার ফলে সমাজে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, যথার্থ সেকুলারিজম গড়ে উঠতে পারেনি। ঐক্যবদ্ধ সিপিআই-ও এসবের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী আন্দোলন করেনি। ফলে দেশের মাটিতে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট, বিশেষত হিন্দু ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট ধর্মগত-বর্ণগত-উপজাতিগত-ভাষাগত বিদ্বেষ থেকেই গিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন এক ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য থাকায় এগুলি ততটা সামনে আসতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে ওই হিন্দু সেন্টিমেন্ট ও ঐতিহ্যবাদকে কাজে লাগিয়ে আরএসএস এবং প্রথমে জনসংঘ ও পরে বিজেপি মাথা তুলে দাঁড়াল। দ্বিতীয়ত, শক্তিশালী বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুপস্থিতি তাদের বিপজ্জনক ভাবে শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ করে দিল। এমনকি বড় বামপন্থী দল সিপিআই, সিপিএম নেতৃত্ব এইসব মধ্যযুগীয় প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদের ভিত্তিতে কোনও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনও গড়ে তোলেনি। শুধু তাই নয়, ঐক্যবদ্ধ সিপিআই এমনকি হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে হিন্দু ও মুসলমান আলাদা জাতি এই বিচিত্র তত্ত্ব খাড়া করে দেশভাগও সমর্থন করেছিল। এসবই আরএসএস-এর শক্তিবৃদ্ধিতে কাজ করেছে। এটা আপনারা মনে রাখবেন।

তৃতীয়ত, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণও আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে যতদিন মহান স্ট্যালিন ও মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল, ততদিন তার অনুপ্রেরণায় উপনিবেশ-আধা উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলন, গণতান্ত্রিক ও গণআন্দোলন জোর কদমে এগোচ্ছিল। যুদ্ধবিরোধী প্রবল শান্তি আন্দোলনও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র থাকা সত্ত্বেও সমগ্র দুনিয়ায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারা, প্রগতিশীল মানসিকতার প্রাধান্য কিছুটা ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে ও আভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের ফলে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে আজ ধর্মীয় মৌলবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জিত অন্ধ মানসিকতা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীলতার স্রোত বইছে। এই পরিস্থিতিও আরএসএস-বিজেপির উত্থানে সাহায্য করছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য মনীষী রমাঁ রলাঁর একটি সতর্কবাণী আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি ১৯৩২ সালেই বলেছেন, ‘‘আজ পৃথিবীতে সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমাবেশ গড়িয়া উঠিতেছে। ... যদি ইহা ধ্বংস হইয়া যায় তবে শুধু সর্বহারারাই ক্রীতদাসে

পরিণত হইবে না, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতারই সমাপ্তি ঘটিবে। বিশ্বকে বহু যুগ পিছনে ফেলিয়া দিবে। ... কয়েক শতাব্দীর মতো সেখানে অন্ধকার গভীর হইয়া নামিয়া আসিবে।"[৪] বাস্তবে যে এটা ঘটেছে আজকের বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন।

বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিবাদী মনন ধ্বংস করতে চায় বিজেপি

আজ যাঁরা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বা আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার লোভে আরএসএস-বিজেপির ঝাণ্ডা বহন করছেন, তাঁরা কি জানেন আরএসএস-বিজেপি এই দেশের নবজাগরণের মনীষীদের আদর্শ ও ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে? এদেশের নবজাগরণের উষালগ্নে রামমোহন রায় ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, "সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি হবে দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পরিকল্পনা। ... ইতিমধ্যেই দু'হাজার বছর ধরে যা জানা ছিল, ছাত্ররা এর দ্বারা সেটাই আয়ত্ত করবে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে এমন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যার ফলে মিথ্যা অহঙ্কার ও অন্তঃসারশূন্য চিন্তা জন্মাবে। যেটা ইতিপূর্বে স্পেকুলেটিভ ব্যক্তিরা করেছেন। ... বেদান্তের যে সব বিষয়বস্তু, সেইসব স্পেকুলেশন থেকে কোনও অগ্রগতি ঘটতে পারে না। ... যে বেদান্ত শেখায় এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও কিছুর বাস্তব অস্তিত্বই নেই, তার শিক্ষা দ্বারা যুবকরা উন্নত নাগরিক হতে পারবে না। ... উন্নততর জ্ঞানার্জন ও উদার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, কেমিস্ট্রি, অ্যানাটমি সহ অন্যান্য কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষা।"[৫] তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে নবজাগরণের রক্তিম সূর্যোদয়ের মুহূর্তে বিদ্যাসাগর আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বললেন, "সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন তা আর বিতর্কের বিষয় নয়। ... ইউরোপ থেকে এমন দর্শন পড়ানো উচিত যে দর্শন পড়লে আমাদের যুবকরা বুঝবে যে বেদান্ত এবং সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন। ... আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে যে, ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি আরব খলিফার চেয়ে কম নয়। তাঁদের বিশ্বাস যে ঋষিদের মস্তিষ্ক থেকে শাস্ত্রগুলি বেরিয়েছে, তাঁরা সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁদের শাস্ত্র অভ্রান্ত। ... যেখানেই আধুনিক ইউরোপের জ্ঞানের আলো পৌঁছেছে এবং যতটুকু পৌঁছেছে সেখানে ততটুকু এদেশীয় শাস্ত্রীয় বিদ্যার প্রভাব কমছে। ফলে এই শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে। ... পড়াতে হবে ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, সাহিত্য, জীবনী, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ন্যাচারাল ফিলজফি, মরাল ফিলজফি, সায়েন্স, পলিটিক্যাল ইকনমি, ফিজিওলজি। ... এমন শিক্ষক চাই যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন, ইংরেজি ভাষা জানেন আর ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত।"[৬] একথা

৪। আই উইল নট রেস্ট— রমাঁ রলাঁ

৫। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠি

৬। বিদ্যাসাগর রচনাবলি থেকে সংকলিত

অনেকেই জানে না, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়েও তিনি দীক্ষা নেননি। কোনও মন্দিরে যাননি। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকে ভগবান, অধ্যাত্মবাদ বা অলৌকিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা নেই। যার জন্য এই ব্যাপারে ইংরেজ সরকার নিযুক্ত তদন্তকারী বিশপ মার্ডক তাঁকে 'র‍্যাঙ্ক মেটেরিয়ালিস্ট' ('চরম বস্তুবাদী') বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। অথচ এই 'চরম বস্তুবাদী' বিদ্যাসাগরকেই শ্রদ্ধা জানাতে অধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর দু'জনেই তাঁর আদর্শ। সমসাময়িক মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবারাও ফুলেও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার যেখানে সংস্কৃত ও ধর্মীয় ভাববাদী দর্শন শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে, সেখানে তার বিরোধিতা করছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ফুলে। বিদ্যাসাগরের অনুগামী বিপ্লবী মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, "... কোনও ধর্মগ্রন্থই অভ্রান্ত হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং এতেও মিথ্যার অভাব নেই।"[৭] "সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় শত্রু আর নেই।"[৮] বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী শিক্ষার গুরুত্ব ও শাস্ত্রীয় গোঁড়ামিমুক্ত মানসিকতা গড়ে উঠুক— নবজাগরণের এই আহ্বান রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ, সুব্রমন্য ভারতী, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, নজরুল সকলের সাহিত্য সৃষ্টিতেই ছিল। আরএসএস-বিজেপি কিন্তু এসবের বিরুদ্ধতা করে। তারা ইংরেজির গুরুত্ব কমিয়ে সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়ে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক শিক্ষা প্রচলনের দিকেই দেশকে নিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ও এদেশের প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকদের সকল গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারকে নস্যাৎ করে দিয়ে 'সবই বেদে আছে', প্রাচীনকালের ঋষিরাই সব আবিষ্কার করে গেছেন, এই অসত্য সকলকে বিশ্বাস করাতে চাইছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত গণেশের মাথায় প্লাস্টিক সার্জারি থেকে শুরু করে ওদের মোসায়েব কিছু পণ্ডিত নানা হাস্যকর উদ্ভট কাহিনী প্রচার করছে। অবশ্য, সম্প্রতি নিক্ষিপ্ত চন্দ্রযান কোন বৈদিক শাস্ত্রের মন্ত্র অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে— সে কথা এখনও ঘোষণা করেনি! অথচ একদিন এই ভূখণ্ডে ধর্মশাস্ত্রের জোরে নয়, তার বিরুদ্ধতা করেই যথার্থ বিজ্ঞান সাধনা হয়েছিল। বিশেষত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের যুগে তো বেশ কিছু অগ্রগতি ঘটেছিল, যেটা পরবর্তীকালে বেদান্তের প্রভাবে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজে তাঁর রচিত প্রখ্যাত 'হিন্দু কেমিস্ট্রি' গ্রন্থে এই অভিযোগ করে গেছেন। ইউরোপে বিজ্ঞানসাধনায় ব্রতী ব্রুনো, গ্যালিলিও থেকে অনেকেই ধর্মীয় রাজতন্ত্রের শাসনে নৃশংস ভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন এবং এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হারিয়েছেন। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের প্রতিবাদে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে

৭। চরিত্রহীন— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

৮। পথের দাবি— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কী, তা আমরা জানি। আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববিদদের কীরূপ ক্ষতি করিয়াছে। যেমন এক একটি নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেই জন্যই ধর্মতত্ত্ববিদরা সকল যুগেই এই সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।"[৯] হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা বিবেকানন্দের এই বক্তব্য অনুযায়ী আরএসএস-বিজেপির এই ভূমিকার বিচার করলে কী দাঁড়ায়? পার্থক্য হচ্ছে, বিবেকানন্দের বিচার অনুযায়ী আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্ব সম্পর্কে নতুন নতুন আবিষ্কার করছে, তাতে প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববিদরা আতঙ্কিত হয়ে বিজ্ঞানসাধনার গতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। আর বর্তমান হিন্দুত্ববাদীরা দাবি করছে, আধুনিক বিজ্ঞানের কোনও নতুন আবিষ্কার নেই, সব আবিষ্কারই প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা করে গেছেন। এই পার্থক্য পরিষ্কার। এটা কি তাঁরা না বুঝে করছেন? নিশ্চয়ই তা নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য, আধুনিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব অস্বীকার করে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যবাদের দিকে পরিচালিত করে দেশের মননকে বিপথগামী করা, যাতে ফ্যাসিবাদী অন্ধ বিশ্বাস দৃঢ় করা যায়। আরেকটা হচ্ছে, হিন্দু ধর্মীয় মৌলবাদ জাগিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে হানাহানি বাধিয়ে জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করা— যেমন ব্রিটিশরা একদিন করেছিল। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে এভাবে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। অন্য দিকে চরম দুর্দশাগ্রস্ত জনগণ যাতে পুঁজিবাদ ও সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ না হয়, তার জন্য তাদের জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, বেকারত্বের জ্বালা, অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু— সব কিছুর কারণ তাদের পূর্বজন্মের পাপের ফল, সবই বিধাতার বিধান, অদৃষ্টের লিখন, খোদা কি মর্জি, নসিব কা খেল— এজন্মে হাসিমুখে এসব দুঃখকষ্ট সয়ে গেলে পরজন্মে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান সুখের বিধান করবেন— এইসব ধর্মীয় প্রবচনে সাধারণ মানুষকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ রাখা। কোনও সৎ ধর্মবিশ্বাস থেকে নয়, অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র থেকেই আরএসএস-বিজেপি এসব করছে। জনগণকে ভেবে দেখতে হবে তাঁরা কি ভারতীয় নবজাগরণের মনীষীদের মহান আদর্শ ও সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করে এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে বর্জন করে আরএসএস-বিজেপির এই ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করবেন? এর দ্বারা দেশ কি আরও অধঃপতনে যাবে না? মানবতার চরম শত্রু ফ্যাসিবাদ আরও শক্তিশালী হবে না?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল হিন্দুত্ববাদীরা

আরেকটি বিষয়ও দেশের জনগণের কাছে আবার আমরা বিবেচনার জন্য উত্থাপন করতে চাই। তাঁরা কি জানেন, শত শত শহিদের রক্তে রঞ্জিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দিয়ে এই আরএসএস তার সম্পূর্ণ

৯। বিবেকানন্দ রচনাবলি

বিরোধিতা করেছে? এই কারণে আরএসএস কোনও পর্যায়েই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়নি। কারণ আরএসএস-এর গুরু গোলওয়ালকর বলেছেন, "ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং সার্বজনীন বিপদের তত্ত্ব থেকে আমাদের জাতিত্বের ধারণা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আমাদের প্রকৃত হিন্দু জাতিতত্ত্বের সদর্থক অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করা হয়েছে, ...ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তার নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের ওপরে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে। ...তারাই একমাত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, যারা তাদের অন্তরে হিন্দু জাতির গৌরব পোষণ করে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে। বাকি যারা দেশপ্রেম জাহির করে হিন্দুজাতির স্বার্থহানি করছে তারা বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু।"[১০] একবার ভেবে দেখুন এই বক্তব্য কী ভয়ঙ্কর! যেহেতু হিন্দু জাতীয় চিন্তা দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়নি, সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তার নেতৃবৃন্দ— দেশবন্ধু, লালা লাজপত, তিলক থেকে শুরু করে নেতাজি, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য সেন, প্রীতিলতারা এমনকি গান্ধীজি, নেহেরু সকলেই আরএসএস-এর বিচারে বাস্তবে 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'দেশের শত্রু'। বিজেপির জনক আরএসএস-এর এই বক্তব্য কি দেশের জনগণ মেনে নেবেন? গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনের বরেণ্য নেতৃবৃন্দ ও মহান শহিদদের অবমাননা করবেন? অথচ সরকারি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ও সংবাদমাধ্যমের প্রচারের জোরে আজ আরএসএস নেতৃবৃন্দ নিজেদের 'দেশপ্রেমিক', 'জাতীয়তাবাদী', 'দেশের স্বাধীনতার রক্ষক' বলে জাহির করছেন। এ কথা আজ কয়জন জানে ব্রিটিশ ভারতে সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভা মৈত্রীবদ্ধ হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল? সেই সময় অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ফজলুল হক এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। এই ঘটনাগুলি কেউ যদি পারেন ভুল প্রমাণ করুন। আমরা কিন্তু তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারি। গোলওয়ালকর এমনও বলেছেন, "হিন্দুস্থানে বিদেশে থেকে আগত সমস্ত অহিন্দু জাতি হয় হিন্দু ভাষা এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে ও পবিত্র বলে জ্ঞান করতে অবশ্যই শিখতে হবে, হিন্দু জাতির ও সংস্কৃতির গৌরব গাথা ভিন্ন অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না। ... অথবা না হলে প্রেফারেন্সমূলক ব্যবহার তো নয়ই, সম্পূর্ণভাবে এই দেশে হিন্দু জাতির অধীনস্থ হয়ে কোনও দাবি ছাড়া, কোনও সুবিধা ছাড়া, এমনকি নাগরিকত্বের অধিকার ছাড়া তাদের এ দেশে থাকতে হবে।"[১১] কী ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক উক্তি! আজ সরাসরি এই কথা মুখে না

১০। বাঞ্চ অব থট্‌স— গোলওয়ালকর

১১। উই অর আওয়র নেশনহুড ডিফাইন্ড— গোলওয়ালকর

বললেও আরএসএস-বিজেপি নেতা ও কর্মীদের নানা মন্তব্যে ও ক্রিয়াকলাপে এই মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। এই মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালে এক সভায় বলেছিলেন, "...ধর্মের সুযোগ নিয়া ধর্মকে কলুষিত করিয়া হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। হিন্দু মাত্রেরই তাহার নিন্দা করা কর্তব্য।"[১২] আরেকটি বক্তৃতায় তিনি বলছেন, "... হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া হিন্দুরাজের ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা।"[১৩] তিনি আরও বলেছেন, "একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থলোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে (হিন্দু ও মুসলিম) কলহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে— স্বাধীনতা সংগ্রামে এই শ্রেণির লোককেও শত্রু গণ্য করা প্রয়োজন।"[১৪] নেতাজি ধর্মবর্জিত রাজনীতি অর্থাৎ যথার্থ সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ... ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে, তা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু ধর্ম কিংবা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নহে। ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা।"[১৫] এ দেশের জনগণ কার বক্তব্য গ্রহণ করবে? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের, না আরএসএসের গুরু গোলওয়ালকরের? রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "যে দেশ প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনও বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে ধর্ম স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেটি সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ।"[১৬] শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "কেবল মহামানবতার আদর্শ গ্রহণ করব, তাকে ভারতের আদর্শ, এশিয়ার আদর্শ, হিন্দুর আদর্শ— এদিক দিয়ে কিছুতেই বিচার করব না, কারণ সেই তো ক্ষুদ্র মনের সঙ্কীর্ণ হীন আদর্শ, কোনমতেই সর্বজনীন মুক্ত আদর্শ নয়।"[১৭] তারপর দুঃখ করে আরও বলেছেন, "যাদের হওয়া উচিত ছিল সন্ন্যাসী, তারা হলেন পলিটিশিয়ান, তাই ভারত পলিটিক্সে এতবড় দুর্গত।"[১৮] যে ২১ বছরের যুবককে একদিন দেশবাসী সশ্রদ্ধ চিত্তে 'শহিদ-ঈ-আজম' বলে ভূষিত করেছিল, সেই ভগৎ সিং ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দেওয়ার পূর্বে লিখেছিলেন তাঁর অমূল্য রচনা 'কেন আমি নাস্তিক', যাতে দেশবাসী বিশেষত ছাত্রযুবকরা এই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়। আজ কি দেশের জনগণ, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ভগৎ

১২। ঝাড়গ্রামের ভাষণ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪-৫-১৯৪০)

১৩। সুভাষচন্দ্র রচনাবলি, ২য় খণ্ড

১৪ ও ১৫। সুভাষচন্দ্র রচনাবলি, ২য় খণ্ড,

১৬। কালান্তর— হিন্দু-মুসলিম,

১৭। শরৎ রচনাবলি,

১৮। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন— সচ্চিদানন্দ চ্যাটার্জী,

সিং সহ সেই যুগের আরও বড় মানুষদের এইসব মহান শিক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে আরএসএস-বিজেপির ঝাণ্ডার তলায় সামিল হবে?

প্রকৃত হিন্দু কারা

যাঁরা সৎভাবে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী তাঁদের বিবেকানন্দের কয়েকটি উক্তি শোনাতে চাই। তিনি বলেছিলেন, "কোনও ধর্মই কখনও মানুষের উপর অত্যাচার করেনি, কোনও ধর্মই ডাইনি অপবাদে নারীকে পুড়িয়ে মারেনি, ... তবে মানুষকে এইসব কাজে উত্তেজিত করল কীসে? রাজনীতিই মানুষকে এইসব অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছে, কখনও ধর্ম নয়।"[১৯] শিকাগোতে বক্তৃতায় তিনি আরও বলেছেন, "সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও এগুলোর ভয়ঙ্কর ফল উগ্রতা বহুদিন এই সুন্দর পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। ... এরা পৃথিবীকে করেছে হিংসায় পূর্ণ। বারবার একেই ভিজিয়েছে মানুষের রক্তে, সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে।"[২০] বিবেকানন্দের এই বক্তব্যের আলোকে একবার আরএসএস-বিজেপির বক্তব্য ও ক্রিয়াকলাপ বিচার করে দেখুন। তারা কি সত্যিই হিন্দুধর্ম অনুসরণ করছে? বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, "আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানেই নিয়ে যেতে চাই যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই, অথচ সে কাজ করতে হবে বেদ-বাইবেল ও কোরানকে সমন্বয় করেই। ... আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। ... আমার যদি একটা সন্তান থাকত, তাকে মনঃসংযোগের অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে এক পংক্তির প্রার্থনা ছাড়া আর কোনও প্রকার ধর্মের কথা আমি শেখাতাম না। তারপর সে বড় হয়ে বিভিন্ন মতামত ও পরামর্শ শুনত, সে এমন কিছুর সাথে পরিচিত হয়ে সত্য হিসাবে গ্রহণ করত। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক যে একই সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান এবং আমি মুসলমান হতে পারি।"[২১] এই বিবেকানন্দকে আরএসএস-বিজেপি নেতৃবৃন্দ হিন্দু বলে স্বীকার করবেন, না বিধর্মী আখ্যা দেবেন? বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ তো মসজিদে নামাজ পর্যন্ত পড়েছিলেন। গীর্জায় প্রার্থনাও করেছেন এবং খুব সহজ ভাষায় বলেছেন, "যাকে কৃষ্ণ বলছ, তাকেই শিব, তাকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়, তাকেই যিশু, তাকেই আল্লা বলা হয়। ... বস্তু এক, নাম আলাদা। ... একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে। হিন্দুরা একঘাট থেকে জল নিচ্ছে কলসি ভরে, বলছে জল। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে চামড়ার ঢোলে, বলছে পানি। খ্রিস্টানরা আর এক ঘাটে জল

১৯। বিবেকানন্দ সমগ্র

২০। শিকাগো ভাষণ,

২১। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,

নিচ্ছে, তারা ওয়াটার বলছে।"[২২] অর্থাৎ ভগবান, গড, আল্লা একই। এই রামকৃষ্ণকে আরএসএস-বিজেপি নেতৃবৃন্দ কী বলবেন? বলবেন, তিনি হিন্দুধর্ম বিরোধী কথা ও আচরণ করেছেন?

তারা রামচন্দ্রের জন্মস্থান দাবি করে, আফগানিস্তানে তালিবানরা যেমন প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করেছে, তেমনি অযোধ্যায় ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ করেছে। এই প্রসঙ্গে পুনরায় বলতে চাই, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ— যাঁরা হিন্দুধর্মের প্রবক্তা বলে খ্যাত এবং হিন্দুদের কাছে পূজিত, তাঁরা কোনওদিন এই দাবি তোলেননি কেন? তাঁরা কি কাপুরুষ ছিলেন? কথিত আছে বাল্মীকি রাম জন্মের বহু পূর্বে রামায়ণ রচনা করেছিলেন, বাবরি মসজিদ থাকাকালীন তুলসীদাস রামায়ণ লিখেছিলেন। এই দুই রামায়ণের কোথাও তো এ কথার উল্লেখ নেই যে রামের জন্মস্থানে বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছে! এবার এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্য শুনুন। তিনি বলছেন, "রামায়ণের কথাই ধরুন — অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে, রামের ন্যায় কেহ কখনও যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। ... কোনও পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কত দূর প্রামাণ্য তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্রমাত্র— এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নেই।"[২৩] এতে পরিষ্কার, বিবেকানন্দ রামের বাস্তব অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেননি, খুঁজতেও নিষেধ করেছিলেন, শুধু রামায়ণ থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন। আজও যাঁরা সততার সাথে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী তাঁরা কি মনে করতে পারেন, আরএসএস-বিজেপি যথার্থই হিন্দুধর্মের পথে চলছে? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নির্ধারিত শিক্ষা অনুসরণ করছে? নাকি তারা হীন রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু ধর্মকে ব্যবহার করছে? একই কথা এদেশের ও বিদেশের মুসলিম মৌলবাদীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তারা হজরত মহম্মদের শিক্ষা অনুসরণ করছে না, ক্ষমতালিপ্সা ও হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি মাথা তুলতে পারছে কী করে?

এটা উদ্বেগের বিষয় যে, অবিভক্ত বাংলায় ও পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মতো ব্যক্তিত্ব স্থান করতে না পারলেও, আজ পশ্চিমবঙ্গেই তৃণমূলবিরোধী মানসিকতাকে হাতিয়ার করে বিজেপি মাথা তুলছে। আপনাদের ভাবতে হবে, তখন ওরা পারেনি, অথচ আজ পারছে কী করে? এটা বুঝতে হলে অতীতের বিস্মৃতপ্রায় এক অধ্যায়কে স্মরণ করাতে হবে যার সাথে পরিচিত কিছু মুষ্টিমেয় অশীতিপর বৃদ্ধ এখনও বেঁচে আছেন, বাকিরা

২২। রামকৃষ্ণ কথামৃত,

২৩। বিবেকানন্দের সাথে আলোচনা— উদ্বোধনী প্রকাশনা, নবম খণ্ড,

মৃত এবং পরবর্তী জেনারেশন কিছুই জানে না। বাঙালির কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়, যেহেতু ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে কলকাতা রাজধানী ছিল এবং এখানেই প্রথম ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমের সভ্যতার আলো পৌঁছেছিল, তার ফলে এখানে প্রথম আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল, ভারতীয় নবজাগরণ ও বিপ্লববাদের সূচনা হয়েছিল। যা দেখে মুগ্ধচিত্তে গোখলে বলেছিলেন, 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো'। এখানেই সশস্ত্র বিপ্লববাদ ও নেতাজিকে কেন্দ্র করে বামপন্থার ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, সমাজতন্ত্রের বিপুল অগ্রগতি, চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সাফল্যে এই দেশে, বিশেষত পশ্চিমবাংলায় মার্কসবাদ-কমিউনিজমের প্রতি শিক্ষিত মহলে আকর্ষণ গড়ে ওঠে। তার ফলেই এখানকার জনগণ বিশেষত শিক্ষিত সমাজ, ছাত্র-যুব সম্প্রদায় চরম প্রতিক্রিয়াশীল আরএসএস ও পরবর্তীকালে জনসংঘের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে গ্রহণ করেনি। আপনাদের স্মরণে রাখা দরকার, জনগণের এই বামপন্থী মানসিকতাকে কাজে লাগিয়েই পশ্চিমবঙ্গে প্রথমে সিপিআই ও পরে সিপিএম শক্তিশালী বামপন্থী দল হিসাবে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনেই কলকাতার বেশিরভাগ লোকসভা ও বিধানসভার আসনে সিপিআই জয়লাভ করেছিল। ১৯৫২ সালে ট্রামভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে শিক্ষক আন্দোলন, ১৯৫৬ সালে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন, পুনরায় ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন সংগ্রামী বামপন্থী ধারায় পরিচালিত হয়েছিল। সিপিএম ও সিপিআই যথার্থ মার্কসবাদী দল না হলেও এই সময়ে সংগ্রামী বামপন্থার চর্চা করত। আমাদের দল আজকের তুলনায় সেদিন ছোট হওয়া সত্ত্বেও এই যুক্ত আন্দোলনগুলিতে আমাদের দলের বিপ্লবী লাইন ও ওদের সংস্কারবাদী ভোটমুখী লাইনের দ্বন্দ্ব ছিল। এই সময়ে কংগ্রেস সরকারের দমন-পীড়নে এই আন্দোলনগুলিতে বহু ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিক শহিদ হন, আহত হন, শত শত কারারুদ্ধ হন। সেই সময়েই আতঙ্কিত ভারতীয় পুঁজিবাদ ও কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কলকাতাকে 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'মিছিল নগরী' আখ্যা দিয়েছিলেন। যেমন একইভাবে অতীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঐক্যবদ্ধ বাংলাকে, কলকাতাকে ভয়ের চোখে দেখত। এই সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনগুলিকে হাতিয়ার করেই প্রথমে ঐক্যবদ্ধ সিপিআই ও পরে সিপিএম প্রভাব বাড়ায়। কিন্তু তারা নেতা-কর্মী-সমর্থক ও জনগণের মধ্যে মার্কসবাদের আদর্শগত চর্চা তো দূরের কথা, বামপন্থী রাজনীতি ও সংস্কৃতির চর্চাও করেনি। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে কোনও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনও গড়ে তোলেনি। ফলে মার্কসবাদ ও বামপন্থার প্রতি অন্ধ আবেগ ও স্লোগানসর্বস্বতার ভিত্তিতে বামপন্থী মানসিকতা গড়ে উঠেছিল এবং দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী-

সমর্থক ও প্রভাবিত জনগণের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সেন্টিমেন্ট সুপ্তভাবে ছিল, নানা ধর্মীয় ও অন্যান্য কুসংস্কারের প্রভাবও ছিল। এইসব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। শক্তিশালী গণআন্দোলনগুলির প্রভাবে এবং প্রবল কংগ্রেসবিরোধী মানসিকতা থেকে ১৯৬৭ সালে বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস পরাস্ত হয়েছিল এবং আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সহ সিপিএম, সিপিআই, অন্যান্য বামপন্থী দল ও বাংলা কংগ্রেস সহ আরও কিছু দল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। একথা আজ অনেকেই জানে না যে সেইসময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের প্রাক্কালে কর্মসূচি রচনায় আমাদের দলের সাথে সিপিএম সহ অন্যান্য দলের গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দেয়। লেনিনের সময় মার্কসবাদীদের সরকার গঠনের সুযোগ আসেনি। একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রে মার্কসবাদীরা পার্লামেন্টে বিরোধী দল হিসাবে কী ভূমিকা পালন করবে, সেই সম্পর্কে তিনি গাইডলাইন দিয়েছিলেন, সরকারে থাকলে তাদের কী ভূমিকা হবে, সেই গাইডলাইন দেওয়ার প্রশ্ন তাঁর সামনে ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালনার একটি ঐতিহাসিক গাইডলাইন উপস্থিত করেছিলেন। আমাদের দলের প্রস্তাব ছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-গরিব কৃষকের শ্রেণিসংগ্রামকে এবং গণআন্দোলনকে উৎসাহিত করবে এবং ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পূর্বের সরকারগুলির মতো পুলিশি আক্রমণ হতে দেবে না। এই প্রস্তাব কিছুতেই সিপিএম সহ অন্য দলগুলি মানতে চাইছিল না। তখন আমাদের দল বলে, এই প্রস্তাব না মানলে আমরা সরকারে যোগ দেব না, বাইরে থেকে সমর্থন করব। সেই সময় সিপিএম কর্মী সহ জনগণের যে সংগ্রামী মানসিকতা ছিল তাতে আমাদের সরকারে যোগদান না করার কারণ জানাজানি হলে তাঁরা প্রশ্নবিদ্ধ হবেন, এই আশঙ্কায় সিপিএম নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্যরা শেষপর্যন্ত আমাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন এই ভরসায় যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ছোট দল, ফলে বিশেষ কিছু করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের দলের তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি হল ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পুলিশি আক্রমণ হবে না। এতে উদ্দীপিত হয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য জনগণের সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের জোয়ার শুরু হল। দিকে দিকে স্লোগান উঠল— 'যুক্তফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার'। পুঁজিপতিরা ও প্রতিক্রিয়াশীলরা আতঙ্কিত হল। অন্য রাজ্যেও এর প্রভাব পড়ছিল। এই পুঁজিপতিদের পরামর্শেই ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় পূর্বতন সরকারের জনপ্রিয় মন্ত্রী কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীকে শ্রমদপ্তর থেকে সরিয়ে সিপিএম সহ অন্যরা পূর্তদপ্তর দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দল আন্দোলন সংক্রান্ত ঘোষিত নীতি কার্যকরী করার স্বার্থে এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে

১৯৭৪ সালে সিপিএম আমাদের দলের সাথে ঐক্য ভেঙে দেয়। এই প্রসঙ্গে আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, ১৯৭৭ সালে সরকার গঠনের প্রাক্কালে সিপিএম নেতা জ্যোতি বসু তাঁর দ্বিতীয় বেতার ভাষণে বলেছিলেন, তাঁদের পরিচালিত সরকারে কোনও অশান্তি অরাজকতা হবে না, কারণ এই সরকারে এস ইউ সি-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বক্তব্যের দ্বারা শিল্পপতি ও প্রতিক্রিয়াশীলদের আশ্বস্ত করা হল। কারণ ওদের দৃষ্টিতে আন্দোলন, লড়াই হচ্ছে অশান্তি, অরাজকতা। সে যাই হোক, সিপিএম আগে যতটুকু সংগ্রামী বামপন্থার চর্চা করত ও গণআন্দোলনে ভূমিকা নিত, প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার চলাকালীন সেই পথ পরিত্যাগ করে একদিকে পুঁজিপতিদের আস্থা অর্জন ও অন্যদিকে পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির উপর হামলা চালিয়ে তাদের প্রভাবাধীন এলাকা দখল করতে থাকে। রাজনীতি চর্চা ও আন্দোলনের পরিবর্তে সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেওয়ার সুবিধাবাদী রাজনীতি চালু করে জনসমর্থন সৃষ্টি ও বেকার যুবকদের দলে টানার পথ নেয়। এই সময়েই 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি'— কথাটা ব্যাপকভাবে চালু হয়। এসব ছাড়াও বৃহৎ দলের আধিপত্যবাদ, অন্য দলের কণ্ঠরোধ, নানা দুর্নীতির প্রশ্রয়দান এসব করতে থাকে এবং এভাবে প্রভাব বৃদ্ধি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তে শ্রেণিভিত্তিক ফ্রন্টের স্লোগান তুলে নিজস্ব দলীয় সরকার কায়েম করার অপচেষ্টা চালায়। এইসময় সিপিএম নেতৃত্ব একদিকে যেমন অন্যান্য শরিক বামপন্থী দলগুলির উপর হামলা চালাচ্ছিল, অন্যদিকে নকশাল আন্দোলনের কর্মীদের উপরও আক্রমণ চালায়। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনে খুনোখুনির রাজনীতি চলতে থাকে। যে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের মধ্যে বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে ব্যাপক হতাশা ও আস্থাহীনতা গড়ে উঠতে থাকে। বামপন্থার মর্যাদা নষ্ট হতে থাকে। এই সময়েই, অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন, তা আজকের দিনে আপনাদের স্মরণ করানো খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, "... এই পরিস্থিতিতে জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়বাদীরা ওঁত পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে। এ কথাটা ক্ষমতাসীন সিপিএম নেতারা বুঝছেন না। ... এইভাবে কমিউনিজমের সুনামকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে কালিমালিপ্ত করছেন"[২৪]। আজকের দিনে এই ওয়ার্নিংয়ের তাৎপর্য কত গভীর আশা করি আপনারা সকলেই এবং সিপিএমের সৎ কর্মী ও সমর্থকেরা বুঝবেন।

পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে ব্যাপক রিগিং-এর মাধ্যমে কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়, সেই সরকার ক্ষমতায় বসেই

২৪। যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক— শিবদাস ঘোষ

আমাদের দল এবং সিপিএম ও নকশালদের উপর ব্যাপক হামলা চালায়, অনেকে খুন হয়। অতি দ্রুত এই সরকার আনপপুলার হয়। ইতিমধ্যে সমগ্র দেশে ও পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস খুবই আনপপুলার হয়, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আবার বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং বড় দল হিসাবে সিপিএম সেই সুবিধা পায়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সিপিএম-এর ফ্রন্ট কেন্দ্রের জনতা পার্টির সমর্থনে বিপুল ভোটে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ক্ষমতা দখল করে। পরবর্তীকালে একটানা ৩৪ বছর শাসন করে। এই শাসনকালে তারা পুলিশ-প্রশাসনকে দলের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করে, প্রোটেকশন দিয়ে অ্যান্টিসোশালদের সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজে লাগায়। স্কুলের দারোয়ান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পর্যন্ত সমস্ত পদে নিয়োগ, সরকারি দপ্তরে প্রোমোশন, ট্রান্সফার সবকিছুই দলীয় স্বার্থে ও দলের নির্দেশে চালায়। কোনও নীতি-আদর্শ দিয়ে নয়, প্রোমোটারি, কন্ট্র্যাক্টরি, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, কাটমানি নেওয়ার সুযোগ ইত্যাদি দিয়ে দলে দলে যুবকদের দলভুক্ত করায়। ভোটে বারবার ব্যাপক রিগিং ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রায় সব পঞ্চায়েত-মিউনিসিপ্যালিটি-কর্পোরেশনের দখল নেয়, এগুলি ব্যাপক দুর্নীতি ও দলবাজির আখড়াতে পরিণত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার সর্বস্তরে দলীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে দলীয় ছাত্র সংগঠন এসএফআই বিরোধীদের ওপর হামলা চালিয়ে, বিরোধীদের কনটেস্ট করতে না দিয়ে একতরফা সব ইউনিয়নই দখল করে নেয়। সর্বত্রই হামলা, সন্ত্রাস, গায়ের জোর, উৎখাত করে দেওয়া, খুনজখম—এসবই চলতে থাকে দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। অন্য দিকে বৃহৎ পুঁজিপতি, বড় ব্যবসাদার, জোতদারদের স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন দমনে গুলি চালিয়ে শ্রমিক-কৃষক হত্যা করে। আমাদের দল প্রাইমারিতে ইংরেজি শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন সহ পাশ-ফেল চালু, বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার সহ শ্রমিক-কৃষকের ও মধ্যবিত্ত জনগণের নানা দাবিতে বহু আন্দোলন গড়ে তোলে। সিপিএম নৃশংসভাবে লাঠিগুলি চালায়, আমাদের দলের ১৭১ জন নেতা-কর্মীকে খুন করায়। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ৫১ জন নেতা-কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করায়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন দমনে ভয়াবহ অত্যাচার চালায়। নন্দীগ্রামে পুলিশ ও অ্যান্টিসোশালদের দিয়ে নৃশংসভাবে গণধর্ষণ ও গণহত্যা করায়। হীন দলীয় স্বার্থে এইসব কার্যকলাপ করে তারা মহান কমিউনিজম ও বামপন্থাকে জনমানসে কলঙ্কিত করে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সিপিএমের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়। এরই সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পরিণতিতে বেরিয়ে আসা তৃণমূল মাথা তোলে এবং বুর্জোয়া শ্রেণি ও সংবাদমাধ্যম সিপিএমের বিকল্প হিসাবে তৃণমূলের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালায়। সিপিএমের অপশাসনে ক্ষিপ্ত মানুষ পরিবর্তন চাইছিল। সেই পরিবর্তনের আওয়াজ তুলে তৃণমূল বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়।

তৃণমূলও সিপিএমের পথেই ব্যপক দুর্নীতিগ্রস্ত অপশাসন চালায়

কিন্তু তৃণমূল শাসনে কী পরিবর্তন এল? নিছক সিপিএম দলের পরিবর্তে তৃণমূল দলের সরকার— এছাড়া আর কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি? সিপিএম শাসনকালে যেসব অপকর্ম ঘটেছিল— পুলিশ প্রশাসন থেকে সর্বত্র দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ভোটে সর্বত্র রিগিং-সন্ত্রাস-জবরদস্তি-বিরোধীদের কনটেস্ট করতে না দেওয়া, অ্যান্টিসোশালদের ব্যবহার, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজত্ব, কাটমানি নেওয়া, ঘুষ নেওয়া, সর্বস্তরে দুর্নীতি, বিরোধীদের ওপর আক্রমণ, গণআন্দোলন দমন ইত্যাদি সবই এই আমলেও ঘটছে সিপিএম রাজত্বের কার্বন কপি হিসাবে। পার্থক্য হচ্ছে, সিপিএম দলের বাঁধন ছিল, ফলে সবই ঘটত গুছিয়ে, বিভিন্ন স্তরের নেতাদের নিয়ন্ত্রণে, কিছুটা সূক্ষ্মভাবে। আর তৃণমূল শাসনে ঘটছে এলোমেলো, খোলামেলা, নগ্নভাবে, বিশৃঙ্খলভাবে। কারণ এখানে সবাই রাজা। এই তৃণমূল শাসন পর্বেই সারদা কেলেঙ্কারি, রোজভ্যালি কেলেঙ্কারি ঘটেছে যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে। যদিও এর সূচনা সিপিএম শাসনকালেই ঘটেছে। এইসব কেলেঙ্কারিতে ও নারদা কাণ্ডে বেশ কিছু তৃণমূল নেতার নাম যুক্ত হয়ে গেছে। এছাড়া সরকারি আয় বাড়াবার অজুহাতে সিপিএম সরকারের সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ মদের দোকান চালু করেছে তৃণমূল সরকার। পথেঘাটে মদ্যপদের অত্যাচার আরও বাড়ছে। যে সরকার কন্যাশ্রী বিতরণ করছে, সেই সরকার এ রাজ্য যে নারীধর্ষণ-নারী পাচারের ঘাঁটি হয়ে গেছে এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যও করছে না। সম্প্রতি লোকসভা ভোটে অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠে জানলেন ব্যাপক কাটমানির কারবার চালাচ্ছে দলের লোকজন। এর বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিলেন। কিন্তু এতে কাজ হবে কি? আবার এই সরকার কিছ নতুন কাজু কি করেনি? অবশ্যই করেছে। যেমন ভোটব্যাঙ্ক তৈরির স্বার্থে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সাইকেল দান, শত শত ক্লাব পুজো কমিটিকে, নানা নাট্য, যাত্রা সংস্থাকে কয়েক কোটি টাকা অনুদান, ঘটা করে পুজো-অনুষ্ঠান, মন্দির সংস্কার, অন্য দিকে ইমাম ও মোয়াজ্জেম ভাতা চালু, হিজাব পরে নামাজে যোগদান ইত্যাদি চলছে। এরপর পুরোহিতদের ভাতাও চালু করেছে। বাইরের থেকে প্রচুর টাকা দিয়ে এক্সপার্ট পরামর্শদাতা আনা হয়েছে যাতে যেভাবেই হোক আগামী নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যায়। অনেকটা তার পরামর্শেই তৃণমূল দল ও সরকার চলছে। 'দিদিকে বলো' বলে একটা হেল্পলাইনও চালু হয়েছে। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হবে কি না, তা ভবিষ্যতই বলবে।

তৃণমূলের শাসনের এই দুর্নীতি, অত্যাচার, জুলুমে ক্ষিপ্ত হয়ে তৃণমূলকে শিক্ষা দেবে এই মন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু মানুষ আরএসএস-বিজেপির খাতায় নাম লেখাচ্ছে। এর মধ্যে তৃণমূল-কংগ্রেস-সিপিএমের কিছু ছোট-বড়-মাঝারি, স্থানীয়, জেলা ও রাজ্যস্তরের নেতাও আছে। অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও বিজেপি

ঢেলে টাকা, চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দিয়ে বেকার যুবকদের দলে ভিড় করাচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করছে। হাওয়া বুঝে সিবিআই-ইডির তালিকাভুক্ত দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত তৃণমূলের একদল নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের একাংশ এখন বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। অনেকে যোগ দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এসবের মধ্য দিয়ে আরএসএস-বিজেপির কলেবরের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। নেতারাও খুব উল্লসিত। তারা আরও উল্লসিত বিগত লোকসভা নির্বাচনে অভাবিত ভোট পেয়ে। পরবর্তী বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গ জয়ের জন্য তারা নানা মহড়া দিচ্ছে।

বামপন্থার দুর্বলতাই বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে

বিজেপি যে হঠাৎ এক লাফে এত ভোট ও সিট পেয়ে গেল, সেটা কি এমনি এমনি ঘটেছে? সেটা কি শুধু টাকার জোরে ও কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতার বলে পেয়েছে? তুলনায় কম হলেও, তৃণমূলও তো টাকা ঢেলেছে। তাহলে এটা সম্ভব হল কী করে? তার উত্তর কমরেড শিবদাস ঘোষের যে হুঁশিয়ারি আগেই উল্লেখ করেছি তার মধ্যেই আছে। কংগ্রেসের পর সিপিএমের দীর্ঘ শাসন পশ্চিমবঙ্গের রেনেসাঁসের ও স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লববাদের ঐতিহ্য ধ্বংস করেছে, সর্বোপরি কমিউনিজম ও বামপন্থার মর্যাদাকে মসীলিপ্ত করেছে। অন্য রাজ্যে মানুষ যেমন কংগ্রেসের পরিবর্তে বিজেপিকে ভোট দেয়, বিজেপির পরিবর্তে কংগ্রেসকে ভোট দেয় বা অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলিকে এভাবে পাল্টাপাল্টি করে, এখানে কিন্তু তেমন করে তৃণমূলের বদলে সিপিএম ভোট পেল না। ২০১১ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও কর্মী-সমর্থকের শক্তিতে, সংগঠনের বিস্তারে, ভোটের হিসাবে প্রধান বিরোধী দল ছিল সিপিএম। তা সত্ত্বেও এ রাজ্যে সিপিএম আজও এত আনপপুলার হয়ে আছে যে তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সিপিএমকে গ্রহণ করল না, করল আরএসএস-বিজেপিকে। শুধু কি তাই? সিপিএমের ২৮ শতাংশ ভোট ৭ শতাংশে নেমে গেল। নিচুতলায় সিপিএমের হিন্দু ও মুসলিম কর্মী-সমর্থক এমনকী স্থানীয় নেতারা অনেকেই পোলারাইজেশনের হাওয়ায় একদল বিজেপিকে, আরেক দল তৃণমূলকে সমর্থন করল। এমনকী গ্রামে-শহরে পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষই প্রত্যক্ষ করেছে সিপিএমের অনেকেই এই যুক্তিতে বিজেপিকে সমর্থন করছে যে এখন রাম আসুক, পরে বাম আসবে। অর্থাৎ এখন তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপিকে জেতাবো, পরে বিজেপি যেন সিপিএমকে জায়গা করে দেবে! এমন ঘটনাও ঘটেছে— কিছু কিছু কেন্দ্রে সিপিএম দলের পোলিং এজেন্ট পর্যন্ত সিপিএম প্রার্থীকে ভোট দেয়নি। এর জন্য নেতারা আত্মসমীক্ষা না করে নিচুতলার কর্মীদের দায়ী করে দায় এড়াতে পারবেন? এর জন্য নেতৃত্ব ও দলের নীতি দায়ী নয়? তারা পশ্চিমবঙ্গে বহু রক্ত ও আত্মদানের বিনিময়ে গড়ে ওঠা বামপন্থার গৌরবকে বড় দল হিসাবে

আত্মসাৎ করে দীর্ঘদিন সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলন ধ্বংস করেনি? বামপন্থার মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করেনি? কর্মীদের বামপন্থী রাজনীতি ও সংস্কৃতিবর্জিত সুবিধাবাদের পঙ্কে নিমজ্জিত করেনি? উন্নত নৈতিকতার চর্চার মানসিকতা ধ্বংস করে সমাজবিরোধীদের আশকারা দিয়ে যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়নি? আদর্শ-চরিত্র-সংগ্রাম নয়, সরকারি ক্ষমতাই শক্তির উৎস— কর্মী সমর্থকদের মধ্যে এই মানসিকতা গড়ে তোলেনি? আমাদের এই অভিযোগ যদি ভুল হয়, সিপিএম নেতৃত্ব সঠিক উত্তর দিলে আমরা মেনে নেব। কোনও বিদ্বেষ থেকে এসব বলছি না। বলছি অতি উদ্বেগে। কারণ এই রাজ্যের যে বামপন্থী ধারাকে ব্রিটিশ সরকার ও পরে কংগ্রেস সরকার অনেক গুলি-গোলা চালিয়েও ধ্বংস করতে পারেনি, সিপিএম সরকারি ক্ষমতায় বসে তাই করে গেল। তাঁরা যদি বামপন্থী ধারায় সরকার চালাতেন, তাহলে ৩৪ বছর সরকার চালনায় তাঁদের শক্তি তো আরও বাড়ত— উল্টো হল কী করে? সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকেরা আমাদের এই সমালোচনা শান্ত মনে বিচার করে দেখবেন। কারণ আপনারা তো একদিন কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। আপনাদের পূর্বে অতীতে এই দলের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে অনেকে শহিদও হয়েছেন, নির্যাতিত-অত্যাচারিত হয়েছেন। কিন্তু আজ এই পরিণতি হল কী করে? আপনারা 'মার্কসবাদ জিন্দাবাদ' স্লোগান শুনে, দলের লোকবল দেখে যোগ দিয়েছিলেন। খুঁটিয়ে দেখেননি দলটির বিচারপদ্ধতি, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, কর্মসূচি, রণনীতি-রণকৌশল, আচার-আচরণ-সংস্কৃতি, নেতাদের জীবনযাত্রা মার্কসবাদ সম্মত কি না।

রাজ্যে তৃণমূলের বদলে বিজেপি এলে কি সুশাসন দেবে?

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের যে অংশ দুর্নীতি বন্ধ, জোরজুলুম-অত্যাচার নিবারণ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে চাইছেন, তারা কি লক্ষ করেছেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ও কেন্দ্রে কীভাবে সরকার চলছে? বিজেপি সরকারে থাকাকালীন কীভাবে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নীরব মোদি, মেহুল চোকসি ও বিজয় মালিয়ারা বিদেশে পালাতে পারল? চরম দুর্নীতিগ্রস্ত এই নীরব মোদি ও মেহুল চোকসির সাথে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও বৈঠক কেন সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে গেল? বিজেপি শাসনে বিজেপি সভাপতি ও তার ছেলের সম্পদ এত বিপুল পরিমাণে বাড়ল কী করে? মধ্যপ্রদেশে বিজেপি শাসনকালীন ৩০ হাজার কোটি টাকার ব্যাপম কেলেঙ্কারি— যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সরকারি চাকরি, প্রমোশন ও মেডিকেলে ভর্তির দুর্নীতিতে বিজেপি মন্ত্রীরা জড়িত ছিল, সেই কেলেঙ্কারির তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ৪৮ জন সাক্ষীকে রহস্যজনক ভাবে খুন করা হয়েছে। এই দুর্নীতি ও খুনের তদন্ত আজও হল না কেন? দোষীরা শাস্তি পেল না কেন? বোফর্সের মতো রাফাল বিমান কেলেঙ্কারির তদন্ত চাপা দেওয়া হল কেন?

কেন জম্মুর কাঠুয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বালিকার ৮ জন ধর্ষণকারী ও খুনি অপরাধীদের শাস্তি না দেওয়ার দাবিতে তৎকালীন দু'জন বিজেপি মন্ত্রী চৌধুরী লাল সিং ও চন্দ্রপ্রকাশ গঙ্গা মিছিল করেছিল? ওখানকার আদালত থেকে বিচার বাইরের রাজ্যের আদালতে আনতে হয়েছিল কেন? একইভাবে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে ২০১৭ সালে ধর্ষিতা নারীর অভিযোগ প্রথমে থানা নিল না। তাঁর বাবা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানালে তাঁকে গ্রেপ্তার ও খুন করা হয়। এরপর ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধর্ষিতা আত্মহত্যা করতে গেলে ব্যাপক হইচই শুরু হওয়ায় শেষপর্যন্ত ধর্ষককে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। কারণ ধর্ষণকারী ক্ষমতাসীন বিজেপির এমএলএ। সম্প্রতি রোড অ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে ধর্ষিতা ও তার আইনজীবীকে গুরুতর আহত ও তাঁর কাকিমাকে খুন করা হয়েছে। সমগ্র দেশে এই নিয়ে প্রতিবাদ হওয়ায় এতদিন বাদে বিজেপি সেই এমএলএ-কে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে বিজেপি-র রাজত্বে পিটিয়ে খুন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভুয়ো সংঘর্ষে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটে শতাধিক মানুষ মারা গেছে। উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও বিহারে সরকার পরিচালিত দুঃস্থ মহিলাদের হোমে ব্যাপক ধর্ষণ, পাচার ও খুনের ঘটনা ধরা পড়েছে। বিজেপি শাসনাধীন গুজরাটে ২০০৫ সালে সোহরাবুদ্দিন সেখ ও তাঁর স্ত্রীকে খুন করা হয়। এই খুনের সাক্ষী তুলসীরাম প্রজাপতিকে খুন করা হয় ২০০৬ সালে। এই খুনে অভিযুক্তদের মধ্যে বিজেপি সভাপতিও ছিলেন। তিনি বিচার চলাকালীন বারবার কোর্টে উপস্থিত না হওয়ায় বিচারপতি লোয়া ২০১৪ সালে ১৫ ডিসেম্বর তাঁকে হাজির হতে নির্দেশ দেন। এরপর ১ ডিসেম্বর বিচারপতি লোয়ার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবার অভিযোগ করে যে এটা খুন এবং ইতিপূর্বে বোম্বে হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস বিচারপতি লোয়াকে ঘুষের প্রস্তাব দিয়ে সম্মত করাতে পারেননি। এর কোনও তদন্ত হয়নি। এই মামলায় সিবিআই সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত না করায় ২০১৮ সালে পরবর্তী বিচারপতি এস জে গর্গ অভিযুক্তদের কোনও শাস্তি দিতে না পারায় রায়দান করতে গিয়ে সোহরাবুদ্দিন পরিবারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভারতে এইভাবে বিবেক দংশনে ব্যথিত কোনও বিচারপতির ক্ষমা চাওয়ার ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দোষীরা যাতে শাস্তি না পায়, সিবিআই তারই বন্দোবস্ত করেছিল। একইভাবে সমঝোতা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ সহ সকল অভিযুক্তকে বিচারপতি জগদীপ সিং সাজা দিতে পারেননি, কারণ এনআইএ কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করেনি। ব্যথিত ও বিস্মিত বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন, 'প্রসিকিউশনের সাক্ষ্যে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ছিদ্র রয়েছে, যার ফলে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়ার সমাধান করা যায়নি।' এই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে কি ন্যায়বিচার দেবে?

যে আরএসএস-বিজেপি নবজাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং এমনকি প্রকৃত হিন্দুধর্ম বিরোধী, তাকে কি জনগণ সমর্থন করতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গে জনগণের যে অংশ বিজেপিকে ক্ষমতায় চাইছেন, এই বিজেপির কাছ থেকে কি তাঁরা দুর্নীতিমুক্ত, গণতান্ত্রিক, অত্যাচার-অবিচারমুক্ত শাসন আশা করতে পারেন? ইতিমধ্যেই তো সিবিআই-ইডি খাতায় অভিযুক্ত অনেকেই বিজেপিতে ভিড় জমিয়েছেন। সেটা কি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধির জন্য? বিধানসভার ভোটের তো এখনও অনেক দেরি, ইতিমধ্যেই এলাকায় এলাকায় তৃণমূল-বিজেপির মারামারি-খুনোখুনি চলছে। এর জন্য কি শুধু তৃণমূল দায়ী, বিজেপিও দায়ী নয়? এই বিজেপি কি এই রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে? এ রাজ্যে তো এরই মধ্যে জোর করে 'জয় শ্রী রাম' বলতে সংখ্যালঘুদের বাধ্য করা হচ্ছে এবং না বললে অত্যাচার করা শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা কি সৎভাবে প্রকৃত ধর্মপ্রচার না গুণ্ডামি? সরকারি ক্ষমতা পেলে এটা আরও বাড়তেই থাকবে। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে যদি বাংলাদেশে হিন্দুদের 'আল্লা হো আকবর' বলতে বাধ্য করা হয় ও মারধর করা শুরু হয়, তখন তাকে কি গুণ্ডামি বলবেন না ধর্মপ্রচার বলবেন?

যারা আরএসএস-বিজেপির পেছনে ছুটছেন, তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন, এই আরএসএস-বিজেপিই রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলের নবজাগরণের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে? এটা কি তাঁরা ঘটতে দেবেন?

তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন, এই আরএসএস-বিজেপিই তো স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তার বীর যোদ্ধা ও শহিদ দেশবন্ধু-বিপিন পাল-সুভাষচন্দ্র-ক্ষুদিরাম-সূর্য সেন-প্রীতিলতা-বাঘা যতীনদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়েছিল এবং তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে মুছে দিতে ষড়যন্ত্র করছে ধর্মীয় উগ্রতা জাগিয়ে? এটা ঘটুক তাঁরা কি চান?

তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন, চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে হিন্দু ধর্ম প্রচার করে গিয়েছেন, আরএসএস-বিজেপি প্রচারিত হিন্দুত্ব তার সম্পূর্ণ বিরোধী? বিজেপি প্রচারিত হিন্দুত্বের উদ্দেশ্য ধর্মীয় নয়, একমাত্র লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বার্থ সিদ্ধি করা।

ভোটের মাধ্যমে এক দলের পরিবর্তে আরেক দলকে সরকারে বসিয়ে জনগণ কী লাভ করছে?

আরও একটি বিষয় পশ্চিমবঙ্গের জনগণের ভাবা দরকার। তাঁরা প্রথমে কংগ্রেসকে অন্ধের মতো সমর্থন করেছিলেন,। তারপর কংগ্রেস শাসনে জর্জরিত হয়ে কংগ্রেসকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অন্ধভাবে সিপিএমকে জিতিয়েছেন। পরে

সিপিএমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সিপিএমকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অন্ধভাবে তৃণমূলকে জিতিয়েছেন। এখন আবার একদল তৃণমূলের দুর্নীতি-জুলুমে ক্ষিপ্ত হয়ে তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অন্ধভাবে বিজেপিকে জেতাবার কথা ভাবছেন। এরপর কাকে জেতাবেন? বারবার এই খেলাই কি চলতে থাকবে? এতে কি অগ্রগতি হচ্ছে, না অধঃপতন দিনকে দিন আরও বাড়ছে? বারবার ওরা কেউ না কেউ স্বর্গরাজ্য বানিয়ে দেওয়ার বুলি আউড়ে ভোটে জিতছে। কিন্তু জনগণ কি জিতছে, না হেরে দুর্গতির চরম সীমা অতিক্রম করছে?

মূল শত্রু পুঁজিবাদকে চিনুন

এই সব দলই ভণ্ড, প্রতারক। কিন্তু মনে রাখবেন, কোনও সৎ দল যদি খুঁজে পান এবং সেই দলকেও যদি জেতান, যত দিন পুঁজিবাদী শোষণ ও শাসন থাকবে, তত দিন বেকারি, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, দুর্নীতি, নারী ও শিশু পাচার, ধর্ষণ ও খুন চলতেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে। আজ পুঁজিবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল, অত্যাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত। তার একমাত্র লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন, তারই স্বার্থে চলছে চূড়ান্ত শ্রমিক শোষণ। শোষিত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে, তার ফলে বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। এর ফলে কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, ছাঁটাই বাড়ছে, সরকারি-বেসরকারি শিল্পে ও দপ্তরে পোস্ট খালি থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ বন্ধ হচ্ছে, চুক্তিভিত্তিক কাজ করানো হচ্ছে যেখানে কাজের সময় সর্বাধিক কিন্তু মজুরি খুবই কম। মালিক ইচ্ছামতো ছাঁটাই করতে পারে, কারখানা বন্ধ করতে পারে, কিন্তু শ্রমিকের প্রতিবাদ-ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ লাভের জন্য, অন্য দেশ লুণ্ঠনের জন্য আক্রমণ করছে, যুদ্ধ বাধাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে, নিরাশ্রয় করছে, ধ্বংসের তাণ্ডব চালাচ্ছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বাজার সঙ্কট আজ এতই তীব্র যে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি যে আমেরিকা কিছুদিন আগে বিশ্বের বাজার গ্রাস করার জন্য গ্লোবালাইজেশন স্কিম চালু করেছিল, আজ কম্পিটিশনে কোণঠাসা হয়ে সে-ই গ্লোবালাইজেশনের বিরুদ্ধে বলছে। সাম্রাজ্যবাদী চীনের সাথে ট্রেড ওয়ার বা বাণিজ্য-যুদ্ধ শুরু করেছে। এ-ও এক ধরনের যুদ্ধ যাকে চলতি ভাষায় বলে হাতে মারা নয়, ভাতে মারা। এই যুদ্ধে ভারত সহ সব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশই জড়িয়ে পড়ছে। সমগ্র বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতি রিসেশন বা মন্দার আক্রমণে বিধ্বস্ত। ফলে লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, আরও বহু কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে।

পুঁজিবাদের মুনাফার লোভ এমন প্রবল যে মূল্যবোধ, মানবিকতা, মানবসভ্যতার স্বার্থ— এগুলির কোনও মূল্য নেই তার কাছে। তাই দেখুন, বিজ্ঞানীরা বারবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন ফসিল অয়েল, কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি শিল্পে

ব্যবহার বৃদ্ধি করায় গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়ছে, তাতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে, মেরু অঞ্চলের বরফের স্তূপ গলে গিয়ে সমুদ্রের জল বাড়ছে, স্থলভাগ বিপন্ন হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশও বিপন্ন হচ্ছে। আবহাওয়ার ক্ষতিকারক পরিবর্তন হচ্ছে। তবুও আমেরিকা সহ কোনও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্ণপাত করছে না পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে। মানবজাতির যত সর্বনাশই হোক, ওদের লাভের পরিমাণ বাড়াতেই হবে। এই পুঁজিবাদ মানবজাতির চরম শত্রু।

মনে রাখবেন, এই পুঁজিবাদই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের পরিবর্তে ভারতবর্ষে শোষণ ও শাসন চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এমনকি খোদ আমেরিকা ও ইউরোপে পুঁজি বিনিয়োগ করে শিল্প চালাচ্ছে, ব্যবসা করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-জাপান-অস্ট্রেলিয়ার সাথে অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি করে ভারত মহাসাগর সহ উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তার করছে। দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই পুঁজিবাদেরই বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে কাজ করেছে, আজ বিজেপি সেই কাজে নিযুক্ত হয়েছে। আর দেশের কী অগ্রগতি হয়েছে? ৬৩ কোটি ভারতীয় কর্মহীন, গত দুই বছরে দুই কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, বিশ্বের ক্ষুধার্ত ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৩, ৬২ শতাংশ ভারতীয় অত্যন্ত গরিব, ৬৭ কোটি ভারতীয় ১ শতাংশ সম্পদের মালিক, প্রতি দিন ২৩ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে, প্রতি দিন ৭ হাজার মানুষ অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, প্রতি ঘণ্টায় ৫ জন কৃষক-শ্রমিক আত্মহত্যা করে, বিগত কয়েক বছরে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে, শিশুমৃত্যুতে, নারী-শিশু পাচারে, নারী ধর্ষণে ভারত বিশ্বে অগ্রণী।

আর কয়েকদিন পরে ১৫ আগস্ট সাড়ম্বরে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। সকালে তোপধ্বনি, সামরিক কুচকাওয়াজ-পতাকা উত্তোলন-দেশের রঙিন উন্নয়নের ফিরিস্তি সহ নেতামন্ত্রীদের ভাষণ চলবে, সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতিভবনে, রাজভবনে বহু তারকাখচিত হোটেলে চলবে বিশাল ব্যয়বহুল ভোজসভা, আলোকসজ্জিত এই আনন্দ উৎসবে যোগ দেবে নেতামন্ত্রী-শিল্পপতি-বড় বড় ব্যবসায়ীরা। আর সেই সময়ে দেখা যাবে এক গভীর অন্ধকারের চিত্র। দেখা যাবে লক্ষ লক্ষ ফুটপাতবাসী মানবসন্তান ডাস্টবিন থেকে আহার সংগ্রহ করছে। এরা জানে না কোথায় তাদের বাবা-মা, কোথায় তাদের ঠিকানা। চলবে কত শত ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষের নীরব অশ্রুবর্ষণ। চলবে যে কোনও মজুরিতে যে কোনও কাজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘোরা লক্ষ লক্ষ মাইগ্র্যান্ট লেবারের এখানে সেখানে মরণপণ ছোটাছুটি, সদ্য ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের আত্মহত্যা, চিকিৎসা-বঞ্চিত মৃত সন্তানকে বুকে নিয়ে কত মায়ের হাহাকার, ঘটবে দুঃসহ দারিদ্র জর্জরিত শত শত বাবা-মায়ের কন্যা সন্তান, শিশু সন্তান বিক্রি। দেখা যাবে গঞ্জে-স্টেশনে-রাস্তার মোড়ে দেহবিক্রির

বাজারে, পরিবারের বেঁচে থাকার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হাজারে হাজারে অসহায় নারী দাঁড়িয়ে খদ্দেরের খোঁজে। আর শোনা যাবে অসংখ্য ধর্ষিতার আর্তনাদ। এই কোটি কোটি ভারতবাসী যারা মনে করে 'মরণ হলেই বেঁচে যাই, এ যন্ত্রণা আর সহা যায় না', তাদের কাছে ১৫ আগস্ট অজানা, অচেনা আর পাঁচটা দিনের মতোই দুঃখময়। যে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন এবং তার পরবর্তী সময়ে ভগৎ সিং, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, চন্দ্রশেখর আজাদ সহ আরও শত শত যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁরা কি দুঃস্বপ্নেও স্বাধীন ভারতের এই মর্মান্তিক অসহ চিত্র কল্পনা করেছিলেন?

তাঁরা কি ভেবেছিলেন, পুঁজিপতি শ্রেণি ও শাসক দলগুলির ষড়যন্ত্রে একদিন এদেশের নবজাগরণের মনীষীদের, বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, শহিদদের স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে এ দেশের ছাত্র-যুবকরা জুয়া-সাট্টা-মদ-ড্রাগ-ব্লু ফিল্ম-নোংরা যৌনতার স্রোতে নিমজ্জিত হবে? জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রগতি রুদ্ধ হবে, মনুষ্যত্ব-মানবিক মূল্যবোধ-রুচি-সংস্কৃতি-স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সবকিছু অবলুপ্ত হয়ে চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, পারিবারিক জীবন-সামাজিক জীবনকে তছনছ করে দেবে? যে কোনও পথেই হোক টাকা রোজগার করে নোংরা ভোগবিলাসই জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে? বিবেকবর্জিত, মনুষ্যত্বহীন, একদল মানবদেহী মত্ত যুবকের কুৎসিত যৌন লালসা পূরণে গ্রামে-শহরে পথেঘাটে, নির্জন ঘরে শত শত শিশুকন্যা থেকে শুরু করে বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষিত হবে, খুন হবে? এই অভিযোগে শিক্ষক, জন্মদাতা পিতাও অভিযুক্ত হবে? এ কোন সভ্যতা? এমন বর্বরতা আদিম সমাজে কেন, পশুজগতেও ঘটেনি। এরা তো পশুরও অধম! শুধু এ দেশেই নয়, সব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশেই আজ কম বেশি এসব ঘটছে। এই পুঁজিবাদ মানবজীবনে অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজ-জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা, রুচি-সংস্কৃতি সবকিছু ধ্বংস করছে। এই পুঁজিবাদ মানবসভ্যতার চরম শত্রু। তাই একে টিকিয়ে রেখে শুধু পাঁচ বছর বাদে একদিন বোতাম টিপে একবার এই দলকে পরের বার অন্য দলকে ভোটে জিতিয়ে এই দুঃসহ সর্বাত্মক সঙ্কটময় জীবনের অবসান ঘটবে না। তাই চাই পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রই শোষণমুক্ত নতুন সভ্যতার পথ প্রদর্শন করেছিল

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যখন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল তখন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নতুন সভ্যতার সূর্যোদয় ঘটিয়েছিল, যাকে মুগ্ধচিত্তে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের মনীষী রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন এবং এ দেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, নজরুল, সুব্রমন্য ভারতী, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং ও আরও অনেকে। সমস্ত রকমের

শোষণমুক্ত এই সমাজতান্ত্রিক সভ্যতাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রথম সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল। রূপায়িত করেছিল যথার্থ অর্থে বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল-এর ধারণা। এই পিপল মানে শ্রমজীবী মানুষ, শোষক শ্রেণি নয়। পুঁজিবাদী দেশে সংবিধান রচনা করেছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুর্জোয়া আইনবিশারদ, বুদ্ধিজীবী। আর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় সংবিধান রচিত হয়েছে কোটি কোটি শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ মতামতের ভিত্তিতে। যেখানে পুঁজিবাদী দেশে মূলত ধনীরাই ভোটে প্রার্থী দাঁড়ান, সেখানে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ভোটে প্রার্থী হতেন অধিকাংশ কেন্দ্রে শ্রমিক-কৃষকরা, মুষ্টিমেয় কেন্দ্রে বুদ্ধিজীবীরা ও সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিরা। ভোটারদের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে হত নির্বাচিত প্রার্থীদের। তাদের কাজ পছন্দ না হলে যে কোনও সময় ভোটাররা তাদের পাল্টে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারত। এই অধিকার কোনও পুঁজিবাদী দেশে নেই। যেখানে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মালিকদের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন, সেখানে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাপূরণ। সেখানে বেকারি, ছাঁটাই বলে কিছু ছিল না, সকলেরই কাজ পাওয়ার সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার ছিল। উৎপাদনের যা আয় হত, তার একটা অংশ ফ্যাক্টরি কমিটি ট্রেড ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করে শ্রমিকদের আর্থিক মজুরি হিসাবে, আরেকটা অংশ সামাজিক মজুরি হিসাবে রাষ্ট্রকে দিত। রাষ্ট্র এই আয় থেকে বিনামূল্যে সার্বজনীন শিক্ষা ও চিকিৎসা, ক্রীড়া ট্রেনিং, সকলের জন্য সমুদ্রের উপকূলে ও পাহাড়ের ধারে স্যানিটোরিয়াম ও স্বাস্থ্য নিবাস, শিশুদের জন্য নার্সারি ও কিন্ডার গার্টেন, বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গদের দেখভাল করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করত। রাষ্ট্র এই আয় থেকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, জল, পরিবহণের সুযোগ ও পোশাক শ্রমিকদের দিত। শ্রমিকরা অল্প ভাড়ায় বাড়ি ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য ও অন্যান্য পোশাক পেত। শ্রমিকরা সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়াও বছরে ১৫ দিন সবেতন ছুটি পেত স্বাস্থ্যনিবাসে বিশ্রামের জন্য। মহিলা শ্রমিকরা বেতন সহ দেড় বছর মাতৃত্বকালীন ছুটি পেত, তারপর রাষ্ট্রের ব্যয়ে ক্রেশে সন্তান রেখে কাজ করতে পারত। কাজের সময় প্রথমে দৈনিক ৮ ঘণ্টা, পরে ৭ ঘণ্টা করা হয়। আরও পরে ৬ ঘণ্টা থেকে ৫ ঘণ্টা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন স্ট্যালিন, মৃত্যুর আগে। রাষ্ট্রের ব্যয়ে শহরে-গ্রামে হাজার হাজার লাইব্রেরি-থিয়েটার মঞ্চ-সিনেমা হল করা হয়েছিল শ্রমিক-কৃষকদের বিশ্ব সাহিত্য চর্চা ও সাংস্কৃতিক বিনোদনের জন্য। শিক্ষক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, চিকিৎসক, আইনজীবী ইত্যাদি সকল পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের আলাদা রোজগার করতে হত না, রাষ্ট্রই তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করত। আদালতে বিচারপ্রার্থীকে কোনও ব্যয় করতে হত না, রাষ্ট্রই সব বহন করত। বাকি অর্থ রাষ্ট্র ব্যয় করত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার,

নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার, শিল্প ও কৃষির উন্নয়নে নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার, প্রশাসনিক কাজকর্ম ও সামরিক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধিতে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, বিপ্লবের পর রাশিয়াই প্রস্তাব দিয়েছিল সকল রাষ্ট্রই সকল যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস করুক, যাতে যুদ্ধের ভয়াল ধ্বংসমুক্ত পৃথিবী গড়ে সমুদয় অর্থ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলি এতে রাজি হয়নি। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশ রাশিয়া একদিন মার্কসবাদকে হাতিয়ার করেই বিশ্বে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল— যেখানে দারিদ্র্য, অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, গণিকাবৃত্তি, এই সবকিছু অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, ধর্মগত-জাতিগত বিদ্বেষের অবসান ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বিশ্ব অলিম্পিকে শীর্ষস্থান দখল করেছিল। বিজ্ঞানে এত অগ্রগতি ঘটেছিল যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বহু নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছিল, প্রথম মহাকাশে মানুষ পাঠিয়েছিল, এবং ১২ জন সোভিয়েত বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

এই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াই সকল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণার কেন্দ্র হয়েছিল, বিশ্বশান্তির অতন্দ্র প্রহরী ছিল। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে এই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তি জার্মানি-ইটালি ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল এবং রমাঁ রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ সহ বিশ্বের সকল মানবতাবাদীরাই সেক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উপর একমাত্র ভরসা ব্যক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই সকল রকম শোষণ-অত্যাচার মুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার এই নতুন সভ্যতার চরিত্র ও বিপুল অগ্রগতি দেখে ভগৎ সিং ফাঁসির পূর্বে নিজেকে মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে পুরুলিয়ার সম্বর্ধনা সভায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় অসংখ্য স্রোত ও প্রতিস্রোতকে দুটি প্রধান বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিপরীতে ধাবমান কমিউনিজমের শক্তিগুলি, সেইজন্যই হিটলারবাদের অবসানের অর্থ কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা"। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৯৪৫ সালে নেতাজি সিঙ্গাপুর বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করেছিলেন, "এখনও জোসেফ স্ট্যালিন বেঁচে আছেন, তাঁর উপরই আগামী দিনে ইউরোপ ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।" গভীর অভিভূত রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালে লিখেছিলেন, "নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ওই তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের ওপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব— এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। ... নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার

পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে। সেটাকে বলে লোভ। প্রার্থনা আপনি জাগে যে, তাদের এই উদ্দেশ্য সফল হোক।”

এটা অতি দুঃখের যে এত সাফল্য সত্ত্বেও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া-চীনের অভ্যন্তরে পরাজিত পুঁজিবাদ অতি সংগোপনে ষড়যন্ত্র চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সংশোধনবাদের পথে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে বিপন্ন মানবজাতির আশা-ভরসার কেন্দ্র রাশিয়া ও চীনে শ্রমিক শ্রেণি সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে, যার ফলে বিশ্বে প্রবল সঙ্কট ও প্রতিক্রিয়ার অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাস যারা জানে, তাদের হতাশার কোনও কারণ নেই। কারণ যে কোনও আদর্শের চূড়ান্ত জয়ের জন্য শত শত বছর জয়-পরাজয়-জয়ের পথে যেতে হয়। যে ধর্মকে ঈশ্বরের বাণী বলা হয়, সেই হিন্দু, খ্রিস্টান, ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। বুদ্ধের বাণীকে বৌদ্ধধর্ম বলা হলেও তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। এই বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৈদিক হিন্দুধর্ম পরাস্ত হয়ে কয়েক শত বছর কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, দেবদেবী পূজা-পশুবলি-ব্রাহ্মণদের দাপট প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার শঙ্করাচার্য অদ্বৈত বেদান্ত দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মকে পরাস্ত করে হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজতন্ত্র বিরোধী পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ইউরোপে রেনেসাঁস থেকে শুরু করলে জয়-পরাজয়ের পথে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য ৩৫০ বছর লেগেছে। এই মানদণ্ডে ৬০/৭০ বছরের সমাজতন্ত্রের বিজয়ের মেয়াদ কতটুকু! আর ধর্মীয় আন্দোলন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তো শোষণ উচ্ছেদের লড়াই ছিল না, এক ধরনের শোষণের পরিবর্তে আরেক ধরনের শোষণ অর্থাৎ দাসপ্রথার পরিবর্তে রাজতন্ত্র, রাজতন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদ কায়েম হয়েছিল। আর সমাজতন্ত্রকে কয়েক হাজার বছরের শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। এসব কথা এর আগেও বিভিন্ন মিটিংয়ে বলেছি, এই কারণেই বলেছি যে এখনও বহু মানুষ সমাজতন্ত্র নিয়ে হতাশায় ভুগছেন, তাঁরা মনে করেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর হবে না, বা হলেও টিকবে না। এই চিন্তা ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। মানবজাতির মুক্তির প্রয়োজনেই শোষিত জনগণ আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। বিপ্লবী দল ও বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, আবার দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। তা না হলে মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ কী? জনজীবনের এই ভয়াবহ সঙ্কট চলতেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে।

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্য সংগ্রাম

এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার উদ্দেশ্য নিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালে একটি যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এদেশের অসংখ্য ছাত্র-যুবকের মতো তিনিও নবজাগরণের মনীষীদের ও বিপ্লবীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালীন বিপ্লববাদে উদ্বুদ্ধ হন এবং একটি নিম্নমধ্যবিত্ত গরিব পরিবারের বাবা-মায়ের চোখের জলকে পেছনে রেখে স্কুলজীবনেই স্বদেশি

আন্দোলনে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অত্যন্ত নির্ভীক, দৃঢ়চিত্তসম্পন্ন ও আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মানব ইতিহাসের সকল যুগের বড় মানুষদের এবং স্বদেশি আন্দোলন যুগের সকল মহান যোদ্ধাদের চরিত্র ও জীবনসংগ্রাম থেকে তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন। প্রবল জ্ঞানচর্চার আগ্রহে এবং সত্যের সন্ধানে ব্রতী হয়ে তিনি এই যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মার্কসবাদের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের বিচারধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, নানা বিষয়ে বিশ্লেষণ, জীবনযাত্রা, রুচি-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট বিদ্রোহের যোদ্ধা হিসাবে জেলে বন্দি থাকাকালীন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে এ দেশের গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলনের ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটতে চলেছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঐক্যবদ্ধ সিপিআইয়ের নেতারা সৎ ও ত্যাগী হলেও মার্কসবাদ সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে না পারায় দল গঠনের পদ্ধতিতে, বিপ্লবী নীতি-কৌশল-কর্মধারা-সংস্কৃতি নির্ধারণে, এক কথায় ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদকে বিশেষভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন, যেটা রাশিয়ায় লেনিন ও চীনে মাও সে তুং করতে পেরেছিলেন। তাই ঐক্যবদ্ধ সিপিআই প্রথম থেকেই সর্বহারা শ্রেণির দলের পরিবর্তে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তাই সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির নেতৃত্বে বিপ্লববিরোধী বুর্জোয়াদের স্বার্থে আপসমুখী ধারা এবং নেতাজির নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিপ্লবী আপসহীন ধারার তীব্র দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও এই অবিভক্ত সিপিআই ১৯২৫ সালে দেওয়া স্ট্যালিনের গাইডলাইন গ্রহণ না করে নেতাজির নেতৃত্বের পরিবর্তে বার বার গান্ধীজির নেতৃত্বকে সমর্থন করেছে, ১৯৪২ সালের আগস্ট অভ্যুত্থান এবং আইএনএ-র লড়াইয়ের বিরোধিতা করেছে, দেশভাগকে সমর্থন করেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে, অশেষ আত্মত্যাগ করেছে, নির্যাতন সহ্য করেছে, অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও সাধারণ ঘরের সন্তান। এদেশীয় পুঁজিপতি টাটা-বিড়লাদের কেউ কিছু করেনি, অথচ তারাই ক্ষমতা হস্তগত করেছে সর্বহারা শ্রেণির যথার্থ মার্কসবাদী দল না থাকার সুযোগ নিয়ে।

তাই কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশে একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল গঠনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। সেদিন তাঁকে কেউ চিনত না, জানত না। পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁরাও ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। অর্থ নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, তাঁর রাত্রি কেটেছে ফুটপাতে, প্ল্যাটফর্মে, পার্কে। দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়েছেন। সেদিন একটা অফিস ঘরও ছিল না। সেদিন শুধু অবিভক্ত সিপিআই নয়, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরসিপিআই— এরাও যথেষ্ট বড় দল ছিল। সেই অবস্থায় একটা দল গড়া কত কঠিন ছিল! কিন্তু একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে শুরু করেছিলেন। অনেকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ

করেছে। বলেছে, চামচিকেও পাখি আর এস ইউ সি-ও পার্টি। বলেছে— এটা পার্টি নয়, এটা একটা ক্লাব। সেই সময় মহান স্ট্যালিন, মাও সে তুং, সিপিআই-কে সমর্থন করছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষকে ব্যঙ্গ করে এই দলগুলো বলত, আপনি কি স্ট্যালিন-মাও সে তুংয়ের থেকেও বড়? তিনি তার উত্তরে বলেছেন, স্ট্যালিন-মাও সে তুং আমার শিক্ষক। কিন্তু আপনারা তাঁদের শিক্ষানুযায়ী এদেশে দল গড়ে তোলেননি। আমি তাঁদের শিক্ষাকে যথার্থভাবে গ্রহণ করেছি এবং তা প্রয়োগ করে দল গড়ে তুলছি। তাঁরা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি জানেন না বলেই ভুলভাবে আপনাদের সমর্থন করেছেন। এটাই সঠিক পথ।

চতুর্দিকে দুর্লঙ্ঘ প্রতিকূলতা, চরম বিরুদ্ধতা— সবকিছুর মধ্যে দিয়েই তিনি এগিয়েছেন একটা বিরাট স্বপ্ন নিয়ে, দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে, সমস্ত প্রতিরোধকে চূর্ণবিচূর্ণ করে। সেই পরিস্থিতি আজ আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। একদল তাঁর যুক্তিকে সমর্থন করেও বলেছিলেন, 'এত বড় দেশ, কত বড় বড় দল, অনেক নামজাদা নেতা। আপনার নাম নেই, লোকবল নেই, অর্থ নেই, প্রচার নেই। ফলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আপনার কেরিয়ার নষ্ট হবে।' তিনি বলেছেন, আমি লড়তে লড়তে মরব, মরতে মরতে লড়ব। কিন্তু যা সত্য বলে বুঝেছি, তা নিয়ে লড়াই করে যাব। মিথ্যার কাছে মাথা নিচু করে বিবেক বিক্রি করতে পারব না। এইভাবেই এই দলটা গড়ে উঠেছে। আমি, কমরেড মানিক মুখার্জী— আমরা কয়েকজন আজও বেঁচে আছি যারা কিছুটা সেই কঠিন কঠোর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর পলিটিক্যাল ক্লাসে আমরা কুড়ি-পঁচিশ জন উপস্থিত হতাম, হাজরা পার্কে দেড়শো-দুশো জন শ্রোতা, তিনি বক্তা। তাতেই আমরা ভাবতাম মিটিং সাকসেসফুল। আমার কী পরিচয়? আমাদের যতটা যোগ্যতা, ক্ষমতা, গুণ আপনারা দেখেন যার জন্য ভালবাসেন, কিছু শ্রদ্ধা হয়তো করেন, এসবই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। আমরা তাঁর শিক্ষায় লালিত, অনুপ্রাণিত। ফলে ৫ আগস্ট এই দিনটি আমাদের চোখের জলের সাথে যুক্ত। আমি তাঁর মৃত্যুর সময়েও উপস্থিত ছিলাম। শেষ সময়ে তিনি শুধু আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। শেষ বিদায়ের ক্ষণে এই আশা নিয়ে— (এখানে কমরেড প্রভাস ঘোষের গলা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে, কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করেন) নির্বাক চাহনি, কিন্তু ব্যক্ত হয়েছিল একটিই আশা যে আমরা এই ঝাণ্ডা বহন করব। আমরা সেই আশা বহন করেই লড়ে যাচ্ছি। আমাদের দল এগিয়ে চলেছে।

ভারতবর্ষে আজ আমাদের কয়েক হাজার কর্মী, কয়েক লক্ষ সমর্থক। আমরা ২৩টি রাজ্যে কাজ করছি। আমাদের শক্তির উৎস কী? আমাদের শক্তির উৎস একমাত্র মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন— মানুষকে জয় করবে বিপ্লবী আদর্শ দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, সত্য দিয়ে। আর জয় করবে ভালবাসা দিয়ে, ভদ্রতা দিয়ে, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি দিয়ে।

যেখানেই অন্যায় অত্যাচার শোষণ দেখবে তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে, লড়াই করবে। এই পার্টি ভোটের পার্টি নয়, এই পার্টি গদি দখলের রাজনীতির পার্টি নয়। এই পার্টি শ্রেণিসংগ্রামের, গণআন্দোলনের, লড়াইয়ের। এই শিক্ষাই তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। এই শিক্ষার ভিত্তিতেই আমরা এগোচ্ছি। এ কথাও আমি আপনাদের বলতে পারি, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। বিশ্বের বহু শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি যাদের সংগ্রামের বহু ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু অন্ধের মতো রাশিয়া-চীন নেতৃত্বকে অনুসরণ করত, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর তারা অনেকেই বিভ্রান্ত, খণ্ডবিখণ্ড, দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ কোনও দিন মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-কে অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। তাঁদের শিক্ষা অনুধাবন করেছেন, বিচার করেছেন মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে, দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। ফলে তিনি ছাত্র হিসাবে স্ট্যালিনকে, মাও সে তুং-কে শ্রদ্ধাও করেছেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষককে শ্রদ্ধা জানিয়েই তাঁদের কিছু ভুলত্রুটি নিয়েও আলোচনা করেছেন।

ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সঠিকভাবে প্রয়োগের ভিত্তিতে এই পার্টিটি গড়ে ওঠার ফলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে যেখানে অন্যান্য দল চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আমাদের দল কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আমরা ব্যথা পেয়েছি, আঘাত পেয়েছি কিন্তু হতাশ হইনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিপর্যয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এই ক্ষেত্রে আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে হাতিয়ার করে— এ কথা আমি গর্বের সাথে দাবি করতে পারি।

আমরা গর্বের সাথে দাবি করতে পারি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এই ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর প্রদর্শিত পথে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের মহান পতাকাকে বহন করে চলেছি। আমরা জানি দুটি পথ আছে। হয় পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদকে টিকিয়ে রাখা, যার অনিবার্য পরিণতি জীবনের সর্বাত্মক সঙ্কটকে বাড়তে দিয়ে মানবজীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলা। আর না হয় চাই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

মনে রাখতে হবে, সমাজ শ্রেণিবিভক্ত ধনী-গরিবে, মালিক-শ্রমিকে, শোষক-শোষিতে। রাজনীতিও শ্রেণিবিভক্ত। দলের নাম, ঝাণ্ডার নাম, স্লোগানে যাই পার্থক্য থাকুক, এইসব সরকারি দলই পুঁজিবাদের স্বার্থে, শোষণ রক্ষার স্বার্থে কাজ করছে আর একমাত্র আমাদের দলই পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী রাজনীতির ঝাণ্ডা বহন করছে।

জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে। প্রতিটি দলের শ্রেণিচরিত্র বুঝতে হবে। খবরের কাগজ-টিভির প্রচারের হাওয়ায় ভেসে, নেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হয়ে, ধর্ম-জাত-বর্ণবিদ্বেষের ষড়যন্ত্রে বিভক্ত হয়ে বা টাকার লোভে কখনও এই দল কখনও ওই দলকে গদিতে বসিয়ে বারবার ঠকতে হয়েছে। এটাই কি জনগণ চলতে

দেবেন? তাই কষ্টকর হলেও রাজনীতি বুঝুন। শহরে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়, কলে-কারখানায়, বস্তিতে, নানা প্রতিষ্ঠানে নিজেরাই পাবলিক কমিটি গড়ে তুলুন। রাজনীতি চর্চা করুন। সংঘবদ্ধভাবে যে কোনও অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করুন। যে কোনও সমস্যা সমাধানে এইসব নেতাদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া নয়, ইজ্জত নিয়ে মাথা তুলে বলিষ্ঠভাবে দাবি আদায়ের জন্য লড়াই করুন। 'সব দলই সমান, সব নেতারাই ঠকায়'— এইসব বলে হা-হুতাশ করে কোনও লাভ হবে না। কেন বারবার ঠকছেন, তার কারণ খুঁজুন। দলের রাজনীতি ও শ্রেণিচরিত্র বুঝুন। আর এটা সঠিকভাবে বোঝার জন্য চাই সঠিক রাজনৈতিক জ্ঞান, যেটা একমাত্র দিতে পারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। আর চাই উন্নত চরিত্র, নৈতিক বল, মনুষ্যত্ব। তার জন্য প্রথমে নবজাগরণের মনীষীদের থেকে, স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী-শহিদদের সংগ্রামী চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে হবে, তারপর আরেক ধাপ এগিয়ে সর্বহারা উন্নত সংস্কৃতি অর্জন করতে হবে। এভাবেই লড়াই করতে করতে কদমে কদমে এগিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতে হবে। একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে শক্তিশালী করতে হবে। ভেবে দেখুন, বড় দল, শত্রু শ্রেণির প্রতিনিধি, ক্ষতি করছে, সর্বনাশ করছে— তার পেছনে ছুটবেন, না তুলনায় ছোট দল আপনার স্বার্থে, গরিবের স্বার্থে লড়ছে, বিপ্লবী আদর্শ-নীতি-চরিত্র নিয়ে চলছে, ভোটের লোভে-গদির লোভে নিজেকে বিক্রি করেনি, তাকে শক্তিশালী করবেন? এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। এই কথা বলেই আমি এখানে শেষ করছি।